Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহসের সন্ধ্যা

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নারীবিষয়ক প্রাগ্রসর চিন্তা

আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকাশকের কথা

পৃথিবী এখন দুভাগে বিভক্ত; ইসলামি শক্তি আর ইসলামবিরোধী শক্তি। সকল ইসলামবিরোধী শক্তি সংঘবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে চায়। ইসলামকে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের সাথে মিলিয়ে একটা মিথ তৈরি করেছে তারা। অন্যদিকে, ইসলাম তার স্বভাবনিয়মে এই জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে অব্যাহতভাবে প্রজ্বলিত রাখতে সদা তৎপর। শত বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে মুসলমানরা ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে ইসলামের আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব, বিভক্তি ও লড়াই তাই স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। পৃথিবীর শুরু থেকে তা অব্যাহতভাবে বিরাজমান।

মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতা প্রতিনিয়ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মুসলমান হিসেবে আমরা যারা এই লড়াইয়ে ইসলামকে বিজয়ী করতে চাই, তাদের প্রথমত জ্ঞানের জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার পূর্বে তাই মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়া বেশি জরুরি। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ইসলামের সাযুজ্য খুঁজে বের করা সময়ের দাবি। তাই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দূর করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ জন্য আমাদের সোনালি ইতিহাস থেকে প্রেরণা খুঁজে ফিরতে হবে।

এসব নিয়ে ভেবেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজচিন্তক জনাব আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ। একুশ শতকের জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের সাহস জোগাতে চেয়েছেন। আও করণীয় বাতলে দিয়েছেন। চিন্তার স্পষ্টতা আনার একটা প্রয়াস তুলে ধরেছেন। লিখেছেন 'সাহসের মন্ত্র'। এই গ্রন্থ কোনো সাহিত্যের রসালো উপস্থাপনা নয়; চিন্তাশীল তারুণ্যের ভাবনার দরজায় করাঘাত করার একটা চেষ্টা মাত্র।

আশা করছি– 'সাহসের মন্ত্র' পড়ে উজ্জীবিত হবে মুসলিম তারুণ্য। বইটির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগামী দিনের পৃথিবী দ্বীন ইসলামের হোক।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩ নভেম্বর, ২০১৯

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখকের কথা

মানবসভ্যতা আজ এক চরম সংকটকাল অতিক্রম করছে। এটিকে ব্যাপক বিশ্লেষণ করে স্যামুয়েল পি হান্টিংটন একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনাম *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order* বা *সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ*। সেই থেকে বিশ্বময় ধর্ম ও সভ্যতাসমূহের মধ্যে এক ধরনের অঘোষিত ক্রুসেড শুরু হয়েছে। আর এই একতরফা লড়াইয়ের শিকার হচ্ছে প্রাচ্যের সভ্যতাসমূহ; বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতা। পশ্চিমা সভ্যতা স্বকল্পিত বিভাজন-রেখা তৈরি করে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম আর প্রাচ্য এক ও অভিন্ন। সবখানে এখন তারা উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো কারণে-অকারণে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। পায়ে পা দিয়ে লড়াই বাধাতে চাইছে। অথচ একটু পেছন ফিরে তাকালে সাদা চোখেই তারা দেখবে– সভ্যতাসমূহ একে অন্যের পরিপূরক। ইতিহাসে তাদের হাতে হাত রেখে চলতে দেখা যায়।

এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বমোড়ল এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট মানবতা ও সভ্যতার দুশমন খুনিচক্রের মোকাবিলা করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি দরকার প্রত্যয়দীপ্ত মন, বুক ভরা সাহস আর সাহসকে উজ্জীবিত রাখার মতো 'মন্ত্র'সমূহ। হিংসা-বিদ্বেষ নয়; ভালোবাসা ও সহনশীলতা, জিঘাংসা নয়; অকাতর ক্ষমা ও দুআ, সংকীর্ণতা নয়; আকাশ সমান উদারতা এবং ভয়-ভীতি নয়; উন্মত্ত ঊর্মিমালায় ভরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওপারের বেলাভূমিতে শান্তির সবুজ পতাকা উড়ানোর দুঃসাহস।

সংস্কৃতির ছদ্মাবরণে বিগত দুশো বছর ধরে গোটা বিশ্বে চলছে বিষময় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। চলেছে অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক গোলামি। সেই নির্যাতন, নিপীড়ন আর গোলামির জিঞ্জির ভেঙে-চুড়ে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করতে চাই সিংহদিল সমর্পিত মানুষের দল।

অসুরীয় লড়াই নয়; বরং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানসম্পন্ন একদল সর্বোসুন্দর মানুষের হাতে থাকবে শান্তির পতাকা। তারা মুখ থুবড়ে পড়া পশ্চিমা সভ্যতাকে দেখাবে জ্ঞানের শিখায় প্রজ্জ্বলিত মশাল আর মুক্তির মোহনামুখী ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত রাজপথ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

PDF বইয়ের
সমাহার
৫০০০+ pdf file

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই বইটি কোনো তাত্ত্বিক বই নয়; বরং লড়াইয়ের সহজ-সরল বিন্যাস। পাঠক যদি এর দ্বারা সামান্যও আলোকিত বা উদ্বুদ্ধ হন, তাহলেই লেখকের সার্থকতা। প্রকাশক এই বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাধিত করলেন। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে সাহসী, দরদি ও প্রত্যয়ী অভিভাবকের ভূমিকা পালন করুক।

বইয়ের কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সাহসের মন্ত্র পাঠে প্রতিটি হৃদয় হোক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত, নতুন চেতনায় শাণিত, প্রশান্ত ও স্বচ্ছ।

আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ
৫ অক্টোবর, ২০১৯

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

সাংস্কৃতিক গতিধারা

সাংস্কৃতিক আন্দোলন: ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও নেতৃত্ব	১৩
করণীয় কর্মসূচি	২৩
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৩২
আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য	৩৯
ললিতকলা ও দাওয়াত	৪৩
সংস্কৃতি ও সরকার	৬০

দ্বিতীয় পর্ব

জ্ঞানের শক্তি

সাহসের মন্ত্র	৭৯
ইসলামি শিক্ষা আন্দোলন: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	৯৩
বিজ্ঞানে মুসলমান	১০৬
নারীর অধিকারে ইসলাম: বিভ্রান্তি ও বাস্তবতা	১২৩

তৃতীয় পর্ব

ইতিহাসের পথে

ইতিহাসের সাথে ঐতিহ্যের পথে	১৬৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম পর্ব

সাংস্কৃতিক গতিধারা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাংস্কৃতিক আন্দোলন : ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও নেতৃত্ব

সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেকোনো বিপ্লবী আন্দোলনের পূর্বশর্ত। মহানবি ﷺ-এর নবুয়তের ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাজিরাতুল আরবে ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিজয়ী হয়। নবুয়তের প্রথম ১৩ বছর রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এই সময়ে যারা দাওয়াত কবুল করেন, তাদের জন্য কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক কর্মসূচি প্রদান করা হয়নি; বরং সে সময় কেবল সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করা হতো। এ সাংস্কৃতিক কর্মসূচিগুলো হচ্ছে–

- মানুষকে তার বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করার আহ্বান। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, একত্ব ও সার্বিক গোলামির প্রতি আহ্বান।
- মানবতার বন্ধু, শিক্ষক, নেতা ও মুক্তিদাতা হিসেবে রাসূলকে পূর্ণ অনুসরণের আহ্বান।
- মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে 'আখিরাত'-এর প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান।

মূলত সংস্কৃতি হচ্ছে বিশ্বাসের প্রতিফলন। সে জন্যই নবি করিম ﷺ তাঁর আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে এই সংস্কৃতির বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। এটা রাসূল ﷺ নিজের ইচ্ছায় করেননি; বরং আল্লাহই মিশন হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরআনের ভাষায়–

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই থেকে একজন রাসূল আবির্ভূত করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতগুলো পড়ে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব, হিকমত ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। আর তারা ইতঃপূর্বে অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।"
সূরা জুমুআ : ২

সংস্কৃতির প্রকৃত কাজ

বিশ্বাস, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের পরিশুদ্ধিই সংস্কৃতির লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের কর্মসূচি ঠিক করে অগ্রসর হতে হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকারের (Priority) বিষয়টি নিয়ে এখনও দ্বিধান্বিত। এ দ্বিধার অবসান হওয়া খুবই জরুরি।

ইসলামের প্রথম যুগে এসব দ্বিধা ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদিনের পর অতিমাত্রায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত মুসলিম শাসকদের মাঝে সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি জন্ম নেয়। পরবর্তীকালের ইমাম ও মুজতাহিদগণ মূলত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন। তখন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা করার সুযোগ বা অবকাশ কোনোটিই পাননি। তবে সাধারণের মাঝে আকিদা, তাজকিয়া ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতার জন্ম দেন।

গোটা পৃথিবীতেই মুসলিমরা অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংকট অতিক্রম করছে। এসব সংকট উত্তরণ করে আবারও গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হলে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামি জাগরণের সম্ভাবনা যতটুকু, তার সামনে সমস্যার পাহাড়ও সে তুলনায় কম নয়। বাংলাদেশের ইসলামপন্থি দলগুলোর সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যেসব প্রয়াস চলে আসছে, কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে বিজয় সুদূর পরাহত। এ জন্যই সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও আগ্রাসনের মাত্রা উপলব্ধি করে আগামী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি আন্দোলন মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য কতিপয় সংগঠনের জন্ম হয়েছে। এসব সংগঠনগুলোর নানান কর্মসূচিও রয়েছে। সাংগঠনিক কর্মসূচিসমূহ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ও যথার্থ কি না তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

আগ্রাসনের কবলে সংস্কৃতি

একটি জাতিকে সাংস্কৃতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে পারলেই সে চিরস্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে। এ জন্যই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি সব সময় আমাদের সংস্কৃতিকে প্রথম টার্গেট করেছে। শুরুতেই তারা আঘাত হেনেছে আমাদের 'বিশ্বাস'-কে। শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে, যেন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রবল না হয়; বরং ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত হয়। তারা যেন ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে উঠে, শিক্ষাব্যবস্থাকে সেভাবেই সাজানো হয়েছে।

আমরা স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও চালু আছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু সেই দেশের মাটি, মানুষের কৃষ্টি-কালচার, ধর্মীয় অবস্থান, বোধ ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা এখনও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারিনি। ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। আমরা আমাদের আকাশ সাংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে আছি। আমাদের আকাশ এখন অন্যের দখলে।

বাংলাদেশের আকাশে চাইলেই যেমন আমাদের ইচ্ছামতো চ্যানেল করতে পারছি না, তেমনি পারছি না কোনো স্বাধীন প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলতে। এসবের অধিকাংশই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে একটি নির্দিষ্ট দেশের অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠা। এসব পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা পাঠক-পাঠিকাদের বৃহদাংশের মনন ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে ধর্মহীনতার দিকে আকৃষ্ট করছে। বিশেষ সাংস্কৃতিক অবয়ব প্রদানের অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকার ঈদ সংখ্যাগুলোর উপন্যাসসমূহের ওপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে– প্রায় সব উপন্যাস এবং বিজ্ঞাপনে ফ্রি-সেক্স, ফ্রি-মিক্সিং, মহিলাদের লো-কাট, স্লিভলেস ব্লাউজ ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে করে আমাদের নারী সমাজে এগুলোর চর্চা বৃদ্ধি পাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত; হয়েছেও তাই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও একবিংশ শতাব্দীর চলমান দুই দশক সাইবার সংস্কৃতির প্রবল ধাক্কায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

মূলত, সাধারণ মানুষ নায়ক-নায়িকাদের জীবনাচারকে মডেল মনে করে। পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষণ-সম্বোধন, আচার-অনুষ্ঠান সবছিতেই ত্বরিত প্রভাব ফেলে শো-বিজ জগতের কর্মীরা। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, রেডিও, টিভি, সিনেমা এবং সাইবার ওয়ার্ল্ড এক অতি ক্ষমতাধর গণমাধ্যম, যা কিনা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা ও কর্মপ্রবাহকে প্রভাবিত করে। মঞ্চ কর্মীদের কার্যক্রমের প্রভাবকেও আমরা খাটো করে দেখতে পারি না। বল্গাহীন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবে আমাদের যুবসমাজ প্রতিনিয়ত হলিউড, বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের রুচি ও স্বভাব দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। যারা এ প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা অতি সাবধানি কিংবা বেখবর।

সামর্থ্যবানদের বিয়েতে দশটা অনুষ্ঠান হয়। আর এর প্রতিটিতেই বেপরোয়া পর্দাহীনতা, খরচের বাহুল্যতা, যৌতুকের পীড়ন যেন স্বাভাবিক ঘটনা। এগুলো কেন ঘটে? মুসলমান ছেলেমেয়ের বিয়েতে ডিজে পার্টি কেন হবে? বিভিন্ন ধর্মীয় দিবসগুলোতে কেন মোমবাতির সারি প্রজ্বলিত করা হবে? জন্মদিনে কেক কাটা, মোমবাতি নেভানো এ সংস্কৃতি কাদের? কেনই-বা মঙ্গল প্রদীপ দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর উদ্বোধন করা হয়? এসবই আগ্রাসনের সহজতম মহড়া।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিদেশি, চ্যানেল, এফ.এম রেডিও-এর পাশাপাশি কিছু এনজিও আমাদের শাশ্বত পারিবারিক প্রথা, অটুট বন্ধন ও সুশান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার জন্য 'কীসের বর, কীসের ঘর' জাতীয় বক্তব্য প্রদান করে আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিভূমিতে আঘাত হানা শুরু করেছে। পাশ্চাত্যের মতো বৈবাহিক বন্ধনমুক্ত লিভ টুগেদার একটি শ্রেণির কাছে বেশ মজাদার ঠেকছে। কিন্তু এর বিষক্রিয়ার ফল সম্পর্কে ওরা আজও উদাসীন। নাজ-নম্র বাঙালি মুসলিম নারীদের লজ্জার আবরণ ছিনিয়ে নিয়ে 'নারী জাগরণের' নামে পর্দাহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বাঙালি মুসলিম নারীবাদীদের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত বহু আগেই (১৮৮০-১৯৩২) পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন– অবরোধ মুক্তি মানে পর্দাহীনতা নয়। নারী পর্দার ভেতরে থেকেও যে বিস্ময়কর ভূমিকা রাখতে পারে আজকের ইরান, সুদান, তিউনেসিয়া, ইউরোপ-আমেরিকাসহ মুসলিম বিশ্বের প্রগতিশীল নারীসমাজ তার প্রমাণ।

আমাদের নাটক, গল্প-উপন্যাসে আমাদের জীবনানুগ বাস্তবতার ছবি এখন আর তেমন দেখা যায় না। কতিপয় আরোপিত বাস্তবতার ছবি এবং এমন এক কল্পিত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাস্তবতা দেখানো হয়, যেখানে পাওয়া যায় 'শ্রেণি সাম্যের' কথা ও কল্পিত 'ফতোয়ার' গল্প। কিন্তু শতকরা ৮৬ ভাগ মানুষের দৈনন্দিন কৃত্যের চিত্র তাতে পাওয়া যায় না।

আমাদের সংস্কৃতিকে যারা আগ্রাসী এবং অপশক্তির হাতে তুলে দিতে চায়, তারা প্রস্তুতি সহকারে অতি কৌশলে সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক গণমাধ্যমসমূহে পরিকল্পিত দখলদারি কায়েম করেছে। বিজ্ঞাপন জগৎকে পুরোপুরি হাতিয়ে নিয়েছে। চোরাচালানি-মাফিয়াচক্রের মতো এদেরও একটি চক্র আছে, যার হাত থেকে আমাদের সংস্কৃতির বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপন বন্ধের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু কই, মুসলমানদের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তো কোনো বিজ্ঞাপন কখনো বন্ধ হতে শুনিনি বা দেখিনি।

যেসব ভারতীয় ছবি বা বিজ্ঞাপন আমরা দেখি, তাতে প্রায়শ দেব-দেবী, পূজা-অর্চনা ও মিথ, নায়ক-নায়িকার অলৌকিক বিজয় দেখানো হয়। কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় কোনো বিষয় চলে এলেই সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র গেল গেল– রব ওঠে। এর হেতু আদৌ বোধগম্য নয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের হীনমন্যতার দিকটিও কম আশ্চর্যজনক নয়।

বস্তুত আগ্রাসনের পথ আমরা নিজেরাই খুলে দিয়েছি। সংস্কৃতির দরজা-জানালায় খিল আঁটা যায় না। আলো-বাতাসের মতো চারদিকের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি এখানে ঢুকে পড়ে। দুর্বল অবকাঠামোর ঘর-বাড়ি যেমন ঝড়ো হাওয়া ও প্রচণ্ড আলোর বিস্ফোরণে ধ্বসে যায়, তেমনি আমাদের সংস্কৃতির বুনিয়াদ তাওহিদ, আখিরাত ও রিসালাতের ওপর থেকে সরে যাচ্ছে বলেই আমরা আগ্রাসনের দুর্বল শিকারে পরিণত হচ্ছি।

মিডিয়া ও সংস্কৃতি

মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমগুলো সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় বিকশিত। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-বেদনা ও তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিষয়কে শৈল্পিক উপায়ে উপস্থাপনের জন্য কবিতা, গান, নাটক, চিত্রকলাসহ নানা বাহন বা ফর্ম জন্ম নিয়েছে। মিডিয়ার জন্ম মূলত একজনের অনুভবকে অনেকজনের কাছে উপস্থাপনের জন্য। মিডিয়ার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে তা পর্যায়ক্রমে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে জাতি, জাতি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এই হাতিয়ারের কাজ হলো সংস্কৃতিকে গ্রহণীয় বা বর্জনীয় করে তোলা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমেই পৃথিবীতে ছোটো মিডিয়ার (Small Media) জন্ম হয়। প্রিন্ট মিডিয়া মূলত ছোটো মিডিয়া। পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, মঞ্চ নাটক ইত্যাদি ছোটো মিডিয়া। বিগত কয়েক দশক থেকে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বড়ো মিডিয়া (Big Media) বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। রেডিও, টিভি, ডিশ, ইন্টারনেট, অডিও ভিডিও এগুলো হলো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান পৃথিবীতে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো মিডিয়া। একটি সত্যকে মিথ্যা, আবার মিথ্যাকে দুর্দান্ত সত্যে পরিণত করার প্রবল ক্ষমতা রয়েছে এই মিডিয়ার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'পোশাক মিডিয়া', যার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব থেকে কেউই মুক্ত নয়।

তাই এই যুগের মানুষ অবতীর্ণ হয়েছে মিডিয়া লড়াইয়ে। মিডিয়া লড়াইয়ের প্রধান বিষয় হলো সংস্কৃতি। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে মানুষের বোধ-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, অনুষ্ঠানসহ প্রায় সবকিছু।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য মিডিয়া এক অসাধারণ হাতিয়ার। এ সত্যটি অনুধাবনের পর ইহুদি ও হিন্দুরা পৃথিবীর বড়ো বড়ো মিডিয়ার মালিকানা অর্জন করে নিয়েছে। একদিকে মুসলিমদের ওপর পরিচালিত দমন-পীড়নের সংবাদ গোপন করে তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা, অপরদিকে ইসলামি আকিদা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে সমূলে নষ্ট করার জন্য নিত্য-নতুন কর্মসূচি সাজিয়ে আকর্ষণীয় উপায়ে পরিবেশন করে যাচ্ছে। ফলে এই মিডিয়া সম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে কখন যে নিজের অজান্তে মুসলিম জাতির অর্ধসচেতন সদস্যগণ সাংস্কৃতিক অপমৃত্যুর শিকার হচ্ছে, তা বুঝতেই পারছে না।

মিডিয়া ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার খতিয়ান টানলে দেখা যায়, দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানকার প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের চেয়ে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে বেশি থাকলেও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ছিল একচ্ছত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে এখন তা-ও অনেকটাই বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় আগে দৈনিক বাংলা ট্রাস্ট নামক সংস্থার অধীনে *দৈনিক বাংলা*, *Bangladesh Times* ও *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* নামক পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হতো, যা সাম্প্রতিককালে বিলুপ্ত হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর *সচিত্র বাংলাদেশ* ও *নবারুণ* নামক পত্রিকা প্রকাশ করছে বহুদিন ধরে। বাংলা একাডেমি ও শিশু একাডেমি কতিপয় পত্রিকা এবং বই প্রকাশ করে আসছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন স্বাধীনতাত্তোরকালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেশ কিছু বই-পুস্তক, চারটি শিশু-কিশোর পত্রিকা ও একটি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশ করছে। এই হলো মোটামুটি খতিয়ান। অপরদিকে বেসরকারি উদ্যোগে জাতীয় ও স্থানীয় মিলে প্রায় সত্তরটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। যার কয়েকটি একযোগে একাধিক স্থান থেকে মুদ্রিত হচ্ছে। এ ছাড়া বহু সংখ্যক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন তো রয়েছেই। প্রকাশনা সংস্থার অধিকাংশই বেসরকারি। বিশেষ মতলবে গড়ে উঠা প্রকাশনা সংস্থা। তাদের মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন বয়সিদের জন্য আলাদা আলাদা পত্রপত্রিকা মানুষের চিন্তার জগৎ ও সংস্কৃতিক মূল্যবোধকে তীব্রভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও সংবাদসমূহ এ দেশের পাঠক-পাঠিকাদের জীবনে নানাভাবে রেখাপাত করে। তারা এসবের দ্বারা কখনো উজ্জীবিত আবার কখনো নিরুৎসাহিত হন। ছোট্ট একটা উদাহরণ, সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহের সবগুলো ঈদসংখ্যা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিশেষ উপন্যাসসমূহে লেখকগণ কয়েকটি বিষয়ে লিখেছেন। যেমন : মহিলাদের পোশাকের বর্ণনা সর্বত্রই এসেছে। দেবর, খালাতো, মামাতো ভাই-বোন, ভাবির খোলামেলা আলোচনা এবং ওদের মাঝে এক ধরনের প্রেম-রোমান্সের কথা এসেছে। আর ওই বছর মহিলাদের মাঝে ঈদে বিশেষ স্টাইলের পোশাক কেনার ধুম পড়ে গেছে। এখন তো সমাজের নারী-পুরুষ সবাই পশ্চিমা পোশাক, আচার-ব্যবহার গ্রহণ করছেন। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে পশ্চিমা পরকীয়া, ফ্রি-সেক্স, লিভ টুগেদার, সমকামিতার মতো সংক্রামক আক্রমণ। আমাদের নাটক, সিনেমা, শর্ট ফিল্ম, গল্প, উপন্যাস সর্বত্রই চলছে ত্রিভুজপ্রেম, বেপরোয়া পরকীয়ার প্রবল ঝড়।

বাংলাদেশে একসময় কেবল মিডিয়া ছিল বাংলাদেশ বেতার ও বিটিভি। বেতারের অনুষ্ঠানসমূহে কিছুটা রয়ে-সয়ে পশ্চিমা প্রভাব পড়লেও কিছুটা জাতীয় চেতনা জীবিত ছিল। তবে বিটিভি তার সামগ্রিক আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনবোধকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি রেডিও-টিভির সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলছে। আর এসব চ্যানেলগুলোতে জনপ্রিয়তা পেতে হরদম বিনোদনের সস্তা বিষয়সমূহ বেছে নেওয়া হচ্ছে। খোলামেলা পোশাকের অনুষ্ঠান, বিজাতীয় সংস্কৃতি আমদানিতে পটু এইসব চ্যানেলগুলো ভদ্রতার মাত্রা ছাড়িয়ে অশ্লীলতাকে প্রোমোট করছে। সময়ের সাথে সাথে প্রোমোটের পরিমাণও বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় কী যে হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলাদেশের আকাশসীমার মালিকানা অন্যদের হাতে বিধায় বাংলাদেশ চাইলেও বিশ্বময় বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে লিপ্ত স্যাটেলাইটসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না। আজ বাংলাদেশে থাকা বিভিন্ন চ্যানেলগুলো পরাশক্তিদের পরস্পর তাদের স্বার্থে বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করে চলেছে। এমতাবস্থায় আমরা গেল গেল বলে যতই চিৎকার করি না কেন, তারা তাদের কাজ ঠিকই নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছে। আর এই তীব্র মিডিয়া লড়াইয়ে গোটা দেশবাসী পর্যায়ক্রমে নিজেদের সুস্থ ও স্বকীয়তাবোধের ধারা হারিয়ে ফেলতে বসেছে। এখান থেকে বাঁচার জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন চেতনা ও কর্মসূচির প্রয়োজন। কেবল দুআ এবং ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে এ ব্যাধির হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

কেন এই আগ্রাসন

এক. অনেকেই মনে করেন, রাজ্যহারা মুসলমানরা বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সংগ্রাম, সাধনা ও প্রচেষ্টার পথ পরিহার করে আপসের ফর্মুলায় আত্মাহুতি দিয়ে সাংস্কৃতিক পরাজয়কে মেনে নিয়েছেন। বিজিতের মানসিকতা নিয়ে বিজয়ীর পূর্ণ অনুসরণ, অনুকরণ করে তাদের কাছাকাছি পৌঁছার দুঃস্বপ্নে বিভোর জাতি আত্মপরিচয় হারাতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে স্বাধীন তুরস্ক 'তুর্কি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' হতে বিমুখ হয়ে ইউরোপীয় হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। বসনিয়া তাদের সচেতনতার কারণে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সক্ষম হয়েছিল। নিঃসন্দেহে দুর্বল সামরিক, সামাজিক ও সামগ্রিক অবস্থান আগ্রাসনের শিকার হওয়ার অন্যতম কারণ। তবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হওয়াটা সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির আত্মপরিচয় বিস্মৃতির করুণ পরিণতি মাত্র।

দুই. কোনো জাতি বা দেশকে স্বাধীন অবস্থানে থাকতে হলে তাকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, কাঠামো ও কর্মকাণ্ডকে হেফাজতের ব্যবস্থা নিতে হয়। জাতীয় ঐক্যের জন্যই এ ব্যবস্থা অপরিহার্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের শাসকগোষ্ঠী এ বিষয়ে বরাবরই উদাসীন ছিল। ইংরেজের পর পাকিস্তান, বাংলাদেশ—এ দুটো আমলেই আমরা হয়ে নিজেদের নিজস্বতার প্রতি বেখেয়াল থেকেছি। সংস্কৃতির বুনিয়াদ শিক্ষাব্যবস্থাকে শাসকদের হাত ধরে জাতীয় প্রয়োজনে নিবিখে গড়ে তোলার কাজটি হয়ে ওঠেনি। বিষয়টি দেখার দরকার ছিল পাকিস্তানের শুরুতেই। যেমনটা করেছে ভারত ও ইরান জন্মলগ্ন থেকেই। অথচ, বাংলাদেশে এ বিষয়টি অতি সযত্নে উপেক্ষিত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন. সংস্কৃতি যেহেতু চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়; বরং দীর্ঘ অনুশীলন ও প্রয়োগের বিষয়, সেহেতু আমরা দেখি আমাদের দেশে যে মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, তার অন্যতম উৎস হলো রাজা-বাদশাহ, জমিদার-তালুকদারদের হেরেম, দরবার এবং সেখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা। হেরেমের হিন্দু রমণীগণ, যাদের নাম পরিবর্তন ছাড়া তেমন কোনো পরিবর্তন রাজা-বাদশাহরা করেননি– তারা নতুন প্রজন্মকে নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চেতনায় পরিপুষ্ট করে গড়ে তুলেছেন। দরবারের অনুষ্ঠানমালাও ছিল হিন্দু পণ্ডিত ও দরবারিদের নিয়ন্ত্রণে।

চার. প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে সংস্কৃতি এখন বন্দি হতে চলেছে। সাংস্কৃতিক পরিগঠনে তার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাথমিক দিকের মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাংস্কৃতিক দিকটি আওতায় আনেননি। এ বিষয়টি তারা ব্যক্তির ইচ্ছায় তারই ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে ব্যক্তিগণ নিজস্ব খেয়াল-খুশিমতো মতামত গঠন, প্রকাশ ও চর্চা করতে থাকেন।

ইসলামি দলগুলো ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার যে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তার ভেতর সাংস্কৃতিক দিকটিকে অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছে। তাঁরা ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা উপলব্ধি করেছেন, বিশ্বাসের পরিশুদ্ধির ব্যাপারটা খেয়াল রেখেছেন, কিন্তু এর যে হাজারো রকমের বহিরঙ্গ ও বহিঃপ্রকাশ গানে, কবিতায়, নাটকে, শিল্পে মূর্ত হয়ে আসছে; সে দিকটি তাদের প্রাথমিক বিবেচনার বাইরে রয়ে গেছে। ইদানীং এ নিয়ে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে; তবে তা যে আন্দোলনের অংশ, সেটা বুঝে নিতে কষ্ট হয়।

আজ যদি বাংলাদেশে কোনো কারণে ইসলাম বিজয়ী হয়; প্রায় চল্লিশোর্ধ রেডিও, টিভি বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো কি আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক সংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের বলয়মুক্ত থাকবে?

ভাবার সময় এখনই

ইসলাম স্থান, কাল, পাত্রের ঊর্ধ্বে এক সর্বকাল উপযোগী শাশ্বত জীবনবিধান। যার প্রতিষ্ঠা মূলত নগরকেন্দ্রিক। মক্কা নগরিতে শুরু হয়ে মদিনায় সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষদের মাঝে পূর্ণতা প্রাপ্তির ফলে ইসলাম আপাগোড়াই সংস্কৃতির

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপযোগিতা অর্জন করতে পারে। ইসলামি জীবনবিধান ও ইসলামি সংস্কৃতির নাম শুনলে যাদের ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়, তারা হয় বিদ্বেষভারাক্রান্ত, নাহয় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। অবশ্য দীর্ঘ কয়েকশত বছর রাজশক্তির দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়া মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখা এবং এর উৎকর্ষের ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখতে না পারার পাশাপাশি অন্যদের সেবাদাসত্বকে আত্মরক্ষার এক আত্মঘাতী কৌশল হিসেবে গ্রহণ করাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

প্রাচ্য-প্রতিচ্যের সর্বত্র মানবরচিত মতবাদসমূহের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সভ্যতা এক নতুন নেতৃত্ব ও সংস্কৃতির জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেই নতুন সংস্কৃতি কী হবে? আমেরিকার বুকে 'The Fastest Growing Religion' হিসেবে স্বীকৃত ইসলাম কি পারবে আগামী দিনের পৃথিবীকে একটি 'New Cultural Order' উপহার দিতে; যার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে? বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ ভাগ মানুষ কি পারবে বিশ্বাসনির্ভর সংস্কৃতির সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়ে তুলতে, যা কেউ উপড়ে ফেলতে পারবে না; বরং সেখান থেকে অসংখ্য ডালপালা বিস্তার লাভ করবে? পত্র-পল্লবে সুশোভিত হবে এবং ফুল ও ফলে এক মহান কল্যাণধারা সূচিত হবে?

তিক্ত হলেও সত্য, উপমহাদেশের সুফি-সাধকগণ, এখানকার শাসকগোষ্ঠী ও বিভিন্ন আন্দোলনের পুরোধাগণ ইসলামি আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে পারেননি। একদল, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। আরেকদল তথাকথিত উপযোগবাদী সংস্কৃতির হাতে আত্মসমর্পণের নির্লজ্জ মহড়া দিয়েছেন। ভিন্ন একটি দল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।

মূলত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দ্বারা ধর্মকে মসজিদ, মঠ, মন্দির, গির্জা-কেন্দ্রিকতা প্রদান, ধর্মীয় অনুশাসনকে ব্যক্তি স্বাধীনতার হাতে বন্দি করে ফেলা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে ধর্মহীন অবয়ব প্রদানের যে সর্বগ্রাসী প্রচেষ্টা, তার ঝাড় সামলানো আজ এক অপরিহার্য, কিন্তু এক অসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঝাড় সামলানোর কাজটিই হতে হবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করণীয় কর্মসূচি

ইসলামি শক্তির ঐক্য

বাংলাদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যে চিত্র ওপরে বর্ণিত হলো, তা থেকে বাঁচতে হলে একক বা একদলের চেষ্টায় কাজ হবে না। রাজনৈতিক মত ও পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের ব্যাপারে ইসলামি দলগুলোর মিল রয়েছে। মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা, এতিমখানাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হবে। তাওহিদ, আখিরাত ও রিসালাতের ব্যাপারে যে সংশয় রয়েছে, তা দূর করে তাওহিদভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা আজ অতীব জরুরি। সমগ্র দেশবাসীর সামনে রিসালাতের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং রাসূলের অনুসরণের অপরিহার্যতা ও তার সঠিক পদ্ধতি তুলে ধরতে হবে। আর সকলের মাঝে জন্ম দিতে হবে আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি। তাহলেই তৈরি হবে সংস্কৃতির মজবুত ভিত্তি। ইসলামি সংস্কৃতির এটিই প্রধান বাণী। এ দেশের আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখগণ ঐক্যবদ্ধ হলে, ইসলামি শক্তি একটু সংগঠিত হলে, যত বড়ো শক্তিধর শক্তিই হোক না কেন, তাদের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না।

প্রয়োজন আজ; কথা নয় কাজ

ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বাণী হচ্ছে কথা ও কাজের মিল। নবি করিম ﷺ-এর আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল তাঁর অনুসারীদের অনুপম চরিত্র।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা যা বলতেন তাই করতেন। মুসলমানদের অবক্ষয়ের কারণ– কথা ও কাজের মিল না হওয়া। অসংখ্য ওয়াজ মাহফিল, বক্তৃতার মঞ্চ, কাগজের পাতায় সর্বত্র আমাদের জ্ঞানী নেতৃবৃন্দ, ওয়ায়েজিন ও তাদের অনুসারীরা ইসলামের ব্যাপারে সারগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিন্তু গোল বেধে যায়, তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে এ সবের বৈপরীত্য দেখলে।

এমতাবস্থায় আমাদের কথা ও কাজের মিল সৃষ্টি করে এক নতুন কর্মসূচির ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। সেই কর্মসূচি হচ্ছে সাক্ষ্যদানের কর্মসূচি। জীবনের ছোটোখাটো বিষয় বাদ দিয়ে 'শুহাদা আলান্নাস'-এর সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করে। প্রয়োজনে শহিদি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা সবার মাঝে ফুটে উঠতে হবে। এমন দিন আসবে, যেদিন আমাদের পির-মাশায়েখ, মসজিদের খতিব, উস্তাদগণ তাদের জীবনে ইসলামের সাক্ষ্য দিয়ে কণ্টকময় জীবনযাপনকে আলিঙ্গন করে নিতে পারবে। সেদিন ইসলামি সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ত্বরান্বিত হবে।

ঘর ও সন্তান

সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, জাতিগত দুর্গতি এবং ব্যক্তিগত অশান্তিতে হতাশ হয়ে যারা বুক চাপড়াচ্ছেন, তাদের জন্য একটিই কথা– ঘর সামলান এবং সন্তানদের যত্ন নিন। সহজ করে বললে, পারিবারিক জীবনে ইসলামি সংস্কৃতি মেনে চলুন। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো :

- পারিবারিক জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।
- ঘরে ঘরে সন্তান-সন্ততির জন্য কুরআন শেখার ব্যবস্থা নিন। যতদূর সম্ভব মসজিদ-মক্তব পাড়ায় পাড়ায় চালু করে তাতে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা নিন।
- ঘরে প্রবেশ এবং বাইরে যেতে সালামের প্রচলন করুন।
- সন্তানদের সুন্দর ও সহজ অর্থবোধক ইসলামি নাম রাখুন। অর্থহীন নাম ও নাম বিকৃত করা থেকে বিরত থাকুন এবং অন্যকেও বিরত রাখুন।
- ছোটো থেকে সন্তানদের পর্দার গুরুত্ব জানিয়ে তা মেনে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করুন। মাহরাম ও গায়রে মাহরাম বিষয়ে সন্তানদের ধারণা দিন।
- যে কারও কক্ষে যেতে অথবা আসতে অনুমতি নেওয়ার আদব শিক্ষা দিন।
- বড়োদের শ্রদ্ধা ও ছোটোদের আদর করার শিক্ষা দিন।
- সকলে একসাথে উপভোগ করা যায়– এমন অনুষ্ঠানমালা সবাইকে নিয়ে উপভোগ করুন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- দানের ব্যাপারে সন্তানদের উৎসাহিত করুন এবং তাদের মাধ্যমে দান করুন।
- সন্তানদের নিয়ে মসজিদে জামায়াতে শামিল হোন অথবা ঘরে জামায়াত করে নামাজ পড়ুন। নামাজ শেষে কুরআন, হাদিস বা সাহাবিদের জীবনী নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- ফজর বা এশার নামাজের পর পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছুক্ষণ হাঁটুন।
- সপ্তাহে কিংবা মাসে একটি করে হলেও পারিবারিক বৈঠক করুন। একটি দারস, পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা এবং আগত বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে সেখানে কথা বলুন ও সমাধান করুন।
- পরিবারের সবাইকে আনন্দে রাখতে পারিবারিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক বিনোদনের আয়োজন করুন। বিভিন্ন ইসলামি অনুষ্ঠান সবাইকে নিয়ে উপভোগ করুন।
- পরিবার গঠনে প্রয়োজন– এমন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে চলুর উদ্যোগ নিন।

দেশ ও জাতির সুরক্ষা

দেশ ও জাতির ব্যাপারে উদ্‌বিগ্নতায় কখনো কখনো আমরা করণীয় বিষয় নিয়ে বিহ্বল হয়ে যাই। অথচ, আমাদের সামনে অনেক কাজ। ইসলাম সব সময় সামাজিক কাজের ওপর জোর দিয়ে থাকে। মসজিদে নববিতে আসহাবে সুফফার সদস্যদের কাছে নবি করিম ﷺ-এর জিজ্ঞাসাগুলো একবার স্মরণ করুন। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আজকে ক্ষুধার্তকে কে খেতে দিয়েছে? আজ কে অসুস্থের সেবা করেছে? আজ কে জানাজায় শরিক হয়েছে?' আর প্রতিটা প্রশ্নের জবাবে তাঁর ﷺ একান্ত সহযোগী আবু বকর ؓ হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন। এটাই ইসলামের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য।

আজ যারা ইসলামের কথা বলবেন, ইসলামি সংস্কৃতির বিজয় কামনা করবেন, তাদেরও এ সৌন্দর্যের পতাকা বহন করতে হবে। সামাজিক কার্যক্রমগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে তাতে শরিক হতে হবে। একটি গ্রহণযোগ্য ও সহজ বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো– উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনায় ফরায়েজি আন্দোলন বা বালাকোট আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ হিসেবে কর্মীরা মুসলিম পরিবারগুলোর ঘরে ঘরে গিয়ে মুষ্টি চাল সংগ্রহ করতেন। এসব অর্থ চলে যেত সুদূরে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দের হাতে।

আজকের দিনেও তেমনি পাড়ায় পাড়ায় মুষ্টি চাল সপ্তাহ একত্র করে তুলে সং
অর্থ থেকে ওই পাড়ারই অভাবী, দুঃখী মানুষ বা পরিবারের পাশে দাঁড়ানো যে
পারে। মানুষ বাঁচলে দেশও বাঁচবে। ইসলামে তাই মানবকল্যাণের মধ্য দি
রাষ্ট্রকল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

একক ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের জনগণের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠার কারণ হ
মানুষের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম হয় আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে।
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাও নানাভাবে বিভক্ত। যথা :

প্রথমত, সাধারণ শিক্ষা এবং মাদরাসা শিক্ষা।

দ্বিতীয়ত, মাদরাসা শিক্ষা আলিয়া, নেছাব ও কওমি নেছাবে বিভক্ত।

তৃতীয়ত, সাধারণ শিক্ষা বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে বিভক্ত।

চতুর্থত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে শিশুর মানসিক বিকাশের ফাউন্ডেশন,
সেখানেই বৈচিত্র্যে ভরপুর। এসব স্কুলগুলোতে বিচিত্র পাঠদান করা হয়।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরবি উপেক্ষিত ও অবহেলিত। অর্থাৎ শিশুর জন্য কুরআন
শিক্ষার আয়োজন নেই বললেই চলে।

তাই সবার জন্য একই রকম ও সমন্বিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা আজ খুব জরুরি হয়ে
পড়েছে। মৌলিক বিষয়গুলো সবার জন্য বাধ্যতামূলক করে এই শিক্ষাব্যবস্থা
প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তাহলেই সাংস্কৃতিক সংকটের কবল থেকে আমাদে
বাঁচানোর একটা পথ হবে।

পরিশুদ্ধ বিশ্বাস

আমরা যতই সাংস্কৃতিক বিচ্যুতির কারণ তালাশ করি না কেন, এর মূল নির্ভ
করছে বিশ্বাসের ওপর। অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাসই আজ নড়বড়ে। ব্যাপকভাবে
মানুষের মাঝে শিরক বাসা বেঁধেছে। শিরকের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে
সব বিকৃত হয়েছে আমাদের কবিতায়, গানে, নাটকে, সিনেমায় এবং সাহিত্যের
সকল শাখায়। পুরাণনির্ভর হিন্দু সাহিত্যে, হিন্দি সিনেমায় যা নেওয়া হয়েছে
আমাদের অবিমৃষ্যকারী নকলবাজদের কারণে তা-ই হুবহু চলে আসছে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহিত্য সংস্কৃতির দিগন্তে। ভাভারি, মারেফতি, লালনগীতি বহু গানেই চলে এসেছে শরিয়ত-মারেফত বিতর্ক। ভক্তিমূলক গানের নামে হামদ ও নাতের পাশাপাশি স্থান করে নিচ্ছে এসব ভাভারি, মারেফতি, মুর্শিদি গান। দেহতত্ত্বের নামে এক অদ্ভুত বিষয় গানে গানে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামবাংলার মানুষের মাঝে। শরিয়ত সামাজিক সুরক্ষার জন্য শর্ত-সাপেক্ষে বহুবিবাহের বিধান দিয়েছে। সবচেয়ে অপছন্দনীয় বলে যে তালাকের অবকাশ রেখেছে, তার ভুল ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে মানুষের মাঝে আল্লাহর বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করার এক ধরনের হীন প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে।

এসব বন্ধ করতে হলে বিশ্বাস শুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদিবাদ ও হিন্দু জাতিসত্তাবাদী শক্তি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান ধ্বংস করার জন্য হাজারো কোটি টাকা দিয়ে গড়ে তুলেছে এক বিশাল মিডিয়া সাম্রাজ্য। প্রিন্ট আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সবগুলোই তাদের হাতে। মুসলমানদের হাতে সে ধরনের অস্ত্র নেই বললেই চলে। অথচ, লড়াই করতে হবে এবং জিততেও হবে সে মিডিয়া দৈত্যের বিরুদ্ধেই।

গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

বিষয়টি নিয়ে যদি পূর্বসূরিদের চিন্তা-ভাবনা থাকত, তারা যদি কিছু গতিশীল কর্মসূচি রেখে যেতেন, তাহলে আজকের লোকদের জন্য কাজটি সহজ হতো। তা না হওয়ায় আগামী দিনের জন্য যারা কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন, তাদের চিন্তার পরিগঠন থেকে শুরু করে বাস্তব মহড়া পর্যন্ত সংস্কৃতির প্রতিটি বিপর্যয়কে নিয়ে ভাবতে হবে।

গবেষণার দরজা খোলা

গতিশীল জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম অমীমাংসিত ও জটিল বিষয়সমূহের জন্য গবেষণা বা ইজতিহাদকে প্রাধান্য দিয়েছে। ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে এসে যখন মুসলমানরা ইজতিহাদের চলমান শকট থেকে নেমে পড়লেন, তখন থেকেই তারা এসে দাঁড়ালেন এক স্থবিরতার মুখে। তাদেরই দেখানো জ্ঞান সাধনার পথ ধরে যখন পূর্ব-পশ্চিমের জাতিসমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সকল দিক দিয়ে শনৈ শনৈ উন্নতির দিকে ধাবিত, তখন মুসলিমরা ইখতিলাফি বিষয়সমূহ নিয়ে আত্মমগ্ন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রয়ে গেল আরও একধাপ পিছিয়ে। বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় জ্ঞানগর্ভের ভাষায় কিছু কিছু বই-পুস্তক অনূদিত হওয়া শুরু হলেও নতুন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটি এখনও পুরোমাত্রায় শুরু হয়নি। ইসলামি অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি নিয়ে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গড়ে উঠেছে, সংস্কৃতি নিয়ে সে ধরনের উদ্যোগ কোথায়? যা কিছু হচ্ছে, তা কেবল কতিপয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক আন্দোলন। সাংস্কৃতিক মাধ্যম, গান, নাটক, সিনেমার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এখনও মতভেদ রয়েছে। গানে যন্ত্রের ব্যবহার করা যাবে কি না, সিনেমা-নাটকে নারী-পুরুষের অভিনয় কতটুকু যুক্তিসংগত? পেশা হিসেবে কেউ এগুলোকে গ্রহণ করতে পারবে কি না? কবিতা, শিল্প ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলাম কত দূর উপস্থাপিত করে বা করে না– এ সকল জিজ্ঞাসার কোনো মীমাংসা আজও হয়নি।

যুদ্ধে যেমন কেউ কেবল তরবারি দিয়ে লড়াই করতে পারবে না, তেমনি সাম্প্রতিক সময়ের গান আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা ছাড়া চলবে না। সুলতান এক ব্যান্ডগ্রুপ একবার এক কনসার্টে সব মিউজিক্যাল যন্ত্রপাতি নিয়ে গাইল। তারা যখন গাইল, সমস্ত শ্রোতামণ্ডলিও তাদের সাথে সাথে গাইলেন। প্রত্যেকের ভেতরে তখন এক প্রবল জিহাদি চেতনা লক্ষ করলাম। আরও লক্ষ করলাম, এক গভীর আল্লাহপ্রেম। এ যেন সেই ছুরি, যার ধার আছে, কিন্তু কে তাকে কেন ব্যবহার করছে তাই হলো বোঝার বিষয়। নিয়ত অপরিশুদ্ধ ও লক্ষ্য অনির্ধারিত থাকলে অনেক সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভালো কাজও মন্দে পর্যবসিত হয়।

সিনেমা-নাটক এখন কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং সমাজ সচেতনতা সৃষ্টির এক ব্যাপক আয়োজন। সাম্রাজ্যবাদীরা রাজ্য ও অর্থনীতির বাজার দখলের পর, এখন মানুষের মনোজগৎ দখলের অবার্থ কৌশল হিসেবে আকাশ সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিয়েছে। তাদের হাত থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষার উপায় নিয়ে কি আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আলেমসমাজ ভাববেন না? এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভির মতামত ও যুক্তিগুলো সামনে আনা যায়। সর্বোত্তম পথ হবে উম্মতের আলেম ও ফকিহদের সম্মিলিত 'ইজমা'।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশিক্ষণ : প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

সকল বিজয়ের মতো সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে পারদর্শিতার জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েই অনেক তরুণের প্রতিভা হারিয়ে যায়। এ জন্য সুস্থ পরিবেশসম্পন্ন প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা দরকার। যেমন : যেসব বিষয় ব্যয়সাধ্য, সেসব ব্যাপারে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রশিক্ষিত লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারটিও দেখতে হবে। কর্মক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অনুকূল না হলে মেধা ও প্রশিক্ষণ তেমন কোনো কাজে লাগে না।

সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা, পরিচর্যা ও প্রচারের জন্য বাংলার মুসলমানদের কোনো কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। যেমন : রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন 'শান্তি নিকেতন'। ১৯২৯ সালে তেমন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য নজরুল আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাংলা একাডেমি, শিল্পকলার মতো কিছু কেন্দ্র গড়েও উঠেছে, কিন্তু সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা ও বাঙালি সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতির লালন-পালন হয় সবচেয়ে বেশি। তরুণদের ওইসব স্থানে পাঠাতে হলে শক্ত গাইডেন্স লাগবে। নিজস্ব প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

জনমত তৈরির অনুষ্ঠানমালা

দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামকে একটি সাংস্কৃতিক বিধান হিসেবে জানে না এবং ইসলামের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই বললেই চলে। তাদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে মসজিদসমূহকে ভিত্তি বানাতে হবে। বিভিন্ন দিবস, যেমন– দুই ঈদ, শবেবরাত, শবেমিরাজ, সিরাতুন্নবি ﷺ, মহরম ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করে মসজিদকেন্দ্রিক আলোচনা সভা, প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। এটি জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে। রমজানে সেহরি ও ইফতারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানমালাও সাজানো যেতে পারে, যার কিছু কিছু বর্তমান রয়েছে। নবি করিম ﷺ-এর যুগে মসজিদ কেবল নামাজের কেন্দ্র ছিল না; বরং ছিল সামাজিক কেন্দ্রও। আজ অপসংস্কৃতির ধারকরা যেমন ওপেনএয়ার কনসার্ট করছে, তেমনি ইসলামি সংস্কৃতির ধারকরাও তা নিতে পারে। অধিকন্তু তারা তা না করেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে যেতে পারে। গ্রাম-বাংলার মানুষ রাত জেগে পুঁথি, জারি-সারি গান শুনে থাকে। মেলায় গিয়ে গান শোনা,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাস্তার ধারে বয়াতিদের গান শোনা বা এসবের প্রতি আকর্ষণ নদীমাতৃক বাংলার মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। আব্বাস উদ্দিন, আব্দুল আলীমের বজ্রকণ্ঠে যেমন একবার গ্রাম-বাংলা জেগেছিল, আজ কি আবার আমরা গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠান করে, সম্মেলন করে তাদের জাগাতে পারি না? আবার কি বাংলার শহর-বন্দরে একটি সাংস্কৃতিক প্রবাহ জাগানো যায় না? যার অন্যতম লক্ষ্য হবে ইসলামি সংস্কৃতির বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছানো।

একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ, বিজয় দিবস ইত্যাদিকে সামনে রেখে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বা সাজ উৎসবের আয়োজন করলে আমাদের অনুষ্ঠানমালা অন্য যে কারও চাইতে সুন্দর ও জমজমাট হতে পারে। কবিতা, আবৃত্তি, কৌতুক, হামদ-নাত, দেশাত্ম ও ভক্তিমূলক গান, জারি-সারি, পল্লিগীতি, গম্ভীরা, গীতি-কবিতা, প্রদর্শনী, চিত্রকলা, বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা কোন ক্ষেত্রে আমরা পারি না? পারি, তবে প্রয়োজন কেবল উদ্যোগ ও আয়োজনের।

পৃষ্ঠপোষকতা, বৃত্তি ও পুরস্কার

সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য কার্যক্রম কখনোই পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব নয়। আমাদের বিগত হাজার বছরের ইতিহাসে আমরা দেখি, সাহিত্য-সংস্কৃতি রাজকীয় ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আকবরের নবরত্ন, সুলতান গিয়াসউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা, আরাকান রাজসভায় আলাওল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-এর শান্তিনিকেতন এসব পৃষ্ঠপোষকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রায়শই দরিদ্র। দারিদ্র্য তাদের মহান করছে। সৃষ্টির উন্মাদনা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার উন্নত প্রকাশনা বের করা, ন্যূনপক্ষে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন রেকর্ড ভিডিও প্রকাশ করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা, শিল্পীর রং-তুলির আয়োজন– এসব তো হচ্ছে না। সকলেই তো আর রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মাতে পারেন না, অধিকাংশরাই হন নজরুল। তাই এদের বড়ো প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতার।

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীদের বৃত্তির প্রয়োজন, যাতে তারা অন্নচিন্তায় কাতর হয়ে সাধনার পথ পরিহার না করেন। প্রয়োজন পুরস্কারের, যা তাদের দ্বিগুণ উৎসাহে সৃষ্টিশীলতার দিকে ধাবিত হতে অনুপ্রাণিত করবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা বলতে পারি– সংস্কৃতি আত্মাকে জাগরিত করার নাম, আত্মপরিচয় সমৃদ্ধ করে মানুষকে 'মানুষ' করার নাম। এ জন্যই সংস্কৃতি সব সময়ই ধর্মপ্রবণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের আত্মাকে কিছু জাগরিত করতে যদি সক্ষম হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্মের মূলশক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করছে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না। প্রচ্ছন্ন এই শক্তিই গানে, কবিতায়, নাটকে, সিনেমায়, ভাস্কর্য, চিত্রকলায় মূর্ত হয়ে ধরা দেয়; যা যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হতে থাকে।

আমাদের সংস্কৃতি প্রবাহিত নদীর মতো। অনেক ছোটো ছোটো শাখা নদী খালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কখনো পলিতে বদ্ধ হয়ে গেছে। কখনো আরও নাব্যতা পেয়েছে, কিন্তু নদী তার গতিপথ হারায়নি। ষড়যন্ত্রকারীরা ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছে, আমাদের সামনে দেয়াল তুলেছে। এতে হতাশ বা নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই। আজ প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও নবিনের উদ্যমকে এক জায়গায় এনে আমাদের নতুন পৃথিবীর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা শাসনের এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের অবসান ঘটেছে। নেতৃত্ব এখন সংস্কৃতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার হাতে। ইন্টারনেট, ডিশ হাইওয়েজ এগুলো তারই প্রতিফলন নয় কি?

মানুষ আজ বিশ্বপল্লির (Globl Village) বাসিন্দা। বাংলাদেশ সেই পল্লিরই একটি ঘর। আমরা চাই কি না চাই বিজ্ঞানের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির যে জোয়ার, তা আমাদেরও প্লাবিত করবে। সেই প্লাবনে যাতে আমরা হারিয়ে না যাই, আমাদের স্বকীয়তা যাতে তলিয়ে না যায়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। গড়ে তুলতে হবে আমাদের স্বকীয় ধারা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

১৭৫৭ সালে পলাশির আক্রমণে সিরাজের পতনের পর নবাব মীর জাফর আলি খানের ক্ষমতা দখলের পর থেকেই মূলত ইংরেজদের শাসন শুরু হয়। ইংরেজরা প্রায় ২০০ বছর বাংলা শাসন করে। এই দুশো বছরে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ ধীরে ধীরে ইংরেজদের সাংস্কৃতিক ধারায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে হিন্দুরা ইংরেজদের সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতি হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করে। এদের দেখাদেখি বাঙালি মুসলমানদের মাঝেও চৈতন্যোদয় হয় এবং একদল রাতারাতি ইংরেজদের অনুকরণ-অনুসরণে প্রতিযোগিতায় আবির্ভূত হয়। অপরদিকে, ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশের শিক্ষা-কাঠামোকে পরিবর্তন করে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করার উদ্যোগ নেয়, যা তাদের একদল মানসপুত্র তৈরি করবে মাত্র।

এ ব্যাপারে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক ও প্রণেতা Lord Mackly বলেন-

> 'আমরা এমন একদল লোক তৈরি করব, যারা পোশাকে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তা-চেতনা, মেজাজ ও চরিত্রে হবে ইংরেজ।'

ইংরেজ শাসনের পাশাপাশি হিন্দু জমিদারদের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণের প্রভাব মুসলমানদের সংস্কৃতি, কৃষ্টিসহ সবকিছুর ওপর পড়তে লাগল। এই প্রভাবের ছোট্ট উদাহরণ এমন যে, পাকিস্তানের কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে আসার পূর্ব পর্যন্ত এমনকী পরেও তিনি যতটা না মুসলমান ছিলেন (আচার-আচরণ ও ব্যবহারিক জীবনে), তার চেয়ে বেশি ছিলেন একজন সাহেব।

যখন পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলো, তখন শাসনদের কথা অনুযায়ী দেশটির আইনের উৎস হওয়ার কথা ছিল কুরআন। যেহেতু এর আইন পরিষদের সদস্য ও শাসকবর্গ ছিলেন মুসলমান। কিন্তু দেশের মানুষের কিংবা নেতাদের দৈনন্দিন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি বিধিমালার প্রয়োগ ছিল অনুল্লেখযোগ্য। শাসকরা তাদের সন্তানদের নাস্তিকতা ও তথাকথিত আধুনিকতার গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে রক্ষা করা তো দূরের কথা; তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক অবস্থান নিয়েও নানা মুখরোচক কথা চালু ছিল।

বাংলাদেশ হওয়ার পর চার মূলনীতির ধাক্কায় হঠাৎ করে শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক থাবা বড়ো ধরনের আঘাত হানে। নাস্তিক্যবাদ ও শিরক মিশ্রিত সংস্কৃতির প্রতাপে ভোগবাদ উৎসাহিত হতে লাগল জোরেশোরে। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি; বরং বিগত ৪৮ বছরে সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমরা আমাদের আদর্শিক অস্তিত্ব হারিয়েছি। ঝুঁকে পড়েছি পশ্চিমা সংস্কৃতির মোহময়তার দিকে। কেবল মুসলমানিত্বই নয়; বাঙালিত্বও হারাতে বসেছি। হাজার বছরের ঐতিহ্যের নামে আমাদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক গোলামে পরিণত করার অপচেষ্টা চলছে। আর্যদের সংস্কৃতের দৈত্যকে তারা আমাদের কাঁধে সওয়ার করানোর পাঁয়তারা করছে।

বিষয়টি উপলব্ধির জন্য নিম্নে আগ্রাসনের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন মাধ্যম, ফলাফল এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

এক

আগ্রাসনের উদ্দেশ্য : চিন্তার পরিবর্তন এবং গোলামি মানসিকতার সৃষ্টি।

আগ্রাসনের মাধ্যম : ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা– এখনও আমরা লর্ড ম্যাকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বলয় থেকে বের হতে পারিনি। দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। শিশুদের অধিকাংশ পাঠ্যবই হয় ভারতীয় নয়তো বিদেশি। মানহীন শিক্ষাব্যবস্থা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে লাখো শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে যায়।

ফলাফল : নাস্তিকতার প্রসার, ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা, ভোগবাদী মানসিকতা তৈরি, দেশপ্রেমের অভাব এবং নিজ দেশকে নিয়ে হীনমন্যতা।

প্রতিরোধের উপায় : সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি কিংবা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলন। বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই

আগ্রাসনের উদ্দেশ্য : বিজাতীয় কালচারে অভ্যস্তকরণ।

আগ্রাসনের মাধ্যম : বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, রেডিও, টিভি), নাইট ক্লাব, সিনেমা, গ্রুপ থিয়েটার, সাহিত্য আড্ডা, ব্যান্ড ইত্যাদি।

ফলাফল : পর্দাহীনতা, পারিবারিক কলহ, পরকীয়া, পরিবারে ভাঙন ইত্যাদি।

প্রতিরোধের উপায় : সুস্থ ধারার মিডিয়া তৈরি, বিনোদনের জন্য প্রচুর কন্টেন্ট তৈরি, পরিশিলিত নাটক-সিনেমা তৈরি, ইরান, তুরস্ক ও সুদানের মতো শিল্প ধারা বজায় রাখা।

তিন

আগ্রাসনের উদ্দেশ্য : আকাশ সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ।

আগ্রাসনের মাধ্যম : ডিস, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং পত্র-পত্রিকায় খোলামেলা উপস্থাপন।

ফলাফল : দেশের তরুণ ও যুবকসমাজ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এমনকী ঘরে বসে সহজেই ইন্টারনেট থেকে অশ্লীল ভিডিও সংগ্রহ করছে। ফলে বিকৃত যৌনাচার, হতাশা বৃদ্ধি ও আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি, সামাজিক বিপর্যয়, পথে-ঘাটে-বাসে-ট্রেনে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে। এগুলো এখন সুস্থ সামাজিক বিকাশের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এসবের আসক্তি মহামারি আকার ধারণ করছে।

প্রতিরোধের উপায় : সুস্থ বিনোদনের প্রসার ঘটাতে হবে। বাড়িতে ছোটো ভাই-বোনদের খেয়াল রাখতে হবে। সমাজে মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। অশ্লীলতার ভয়াভহতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

চার

আগ্রাসনের উদ্দেশ্য : জীবনাচার বদলে দেওয়া।

আগ্রাসনের মাধ্যম : জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুকরণ। জন্মদিনে কেক কাটা, বাতি নেভানো, মঙ্গল প্রদীপ, ধর্মীয় দিবসে মোমবাতি সারি, গায়ে হলুদের নামে অশ্লীলতা ইত্যাদি।

ফলাফল : আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার হারিয়ে যাচ্ছে। শিরক এবং যৌতুকের পীড়ন বাড়ছে। বিয়ে কঠিন হচ্ছে এবং এর ফলস্বরূপ লিভ টুগেদার, পরকীয়া এবং সমকামিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিরোধের উপায় : নিজেদের কালচারকে সংরক্ষণ করা। বিয়েকে সহজ করা। দিবসগুলোর ভাবমূর্তি ঠিক রাখা।

পাঁচ

আগ্রাসনের উদ্দেশ্য : বিশ্বাসে ফাটল ধরানো।

আগ্রাসনের মাধ্যম : সংশয়পূর্ণ বই, গান, নাটক, সিনেমা।

ফলাফল : নিজেদের আদর্শের প্রতি সংশয় জন্ম নেওয়া। একত্ববাদের ব্যাপারে ঈমান দুর্বল হওয়া।

প্রতিরোধের উপায় : তাওহিদের প্রচার।

ছয়

আগ্রাসনের উদ্দেশ্য : সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করা।

আগ্রাসনের মাধ্যম : সালাম না দেওয়া, অনুষ্ঠান শুরু বা শেষে আল্লাহর নাম না নেওয়া, টেলিফোনে শুধু হ্যালো বলা, সালাম দিলে সেকেলে ভাবা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বড়ো-ছোটোর মর্যাদা উল্লেখযোগ্য হয়ে চোখে না পড়া।

ফলাফল : ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি।

প্রতিরোধের উপায় : সালামকে ব্যাপক আকারে প্রসার করতে হবে। মূল্যবোধ সংরক্ষণ করতে হবে।

কেন এই আগ্রাসন

- অনেকেই মনে করেন, রাজ্যহারা মুসলমানগণ বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সংগ্রাম-সাধনা ও প্রচেষ্টার পথ পরিহার করে আপসের ফর্মুলায় আত্মাহুতি দিয়ে সাংস্কৃতিক পরাজয়কে মেনে নিয়েছেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হওয়াটা সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির পরিচয় বিস্তৃতির পরিণামেই বেশি হয়।
- কোনো জাতি বা দেশ যখন স্বাধীন অবস্থানে থাকে, তখনই তাকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, কাঠামো ও কর্মকাণ্ড হেফাজতের ব্যবস্থা নিতে হয়। জাতীয় ঐক্যের জন্যই এই ব্যবস্থা অপরিহার্য।
- প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে সংস্কৃতি এখন তার হাতে বন্দি হতে চলেছে। সাংস্কৃতিক পরিগঠনে তার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাথমিক দিকের মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিকটি আওতায় আনেননি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ বিষয়টি তারা ব্যক্তির ইচ্ছার কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে ব্যক্তি সমস্ত খেয়াল-খুশিমতো মতামত গঠন, প্রদান ও চর্চা করতে থাকেন।

- বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে তারা সাংস্কৃতিক দিকটিকে অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন।
- ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ফলে সেখানে যেমন ধর্মীয় অনুশাসন, আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানকে ব্যক্তির ইচ্ছার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তেমনি মুসলিম দুনিয়াতেও এর হিড়িক পড়েছে।

আমাদের করণীয়

আমাদের বে-খেয়াল, ঔদাসীন্য, শৈথিল্য ও উদারতার সুযোগে আগ্রাসী শক্তি সামগ্রিকভাবে আমাদেরকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত করেছে। চটজলদি এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। আবার সামগ্রিকভাবে এই অবস্থা চলতেও দেওয়া যায় না।

আজ পৃথিবী একটা বিরাট পল্লি (Global Village)। হাজার মাইল ব্যাসার্ধের এই গ্রহটি এখন ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। দশ-বিশ হাজার মাইল দূরের একটি ঘটনা বা অনুষ্ঠান আজ ঘরে বসে খুব সহজেই উপভোগ করা যায়। স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, হাইওয়েজ সবকিছুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। সবকিছু এখন সময়ের সাথে চলছে সমান তাল ও গতিতে। যে বিশাল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশ্বময় শুরু হয়েছে, যেভাবে বিনোদনের বহুজাতিক কোম্পানি গড়ে উঠছে, যে হারে মাইকেল জ্যাকসন, জেনিফার লোপেজ, জাস্টিন বিবারের মতো শিল্পী তরুণ-তরুণীদের উন্মাতাল করছে, তা প্রতিনিয়ত আমাদের জনগোষ্ঠীকেও প্রভাবিত করছে এবং করবে। এর থেকে বাঁচার যেন কোনো পথ নেই।

তাই বলে বসে থাকলে তো আর চলবে না। আমরা আমাদের প্রয়াস অব্যাহত রাখি। সফলতা তো সময়ের ব্যাপার, যোগাযোগের ব্যাপার এবং আদায় করে নেওয়ার ব্যাপার। এ ব্যাপারে কিছু করণীয় কাজ হলো–

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- দেশবাসীর কাছে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে হবে। এ জাতি সাংস্কৃতিক পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার পরিণাম ও তার ইতিহাস জানে না। সে বিষয়গুলো জাতির সামনে পরিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন আলেম, মসজিদের ইমাম, কবি-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও লেখকগোষ্ঠীসহ সবাইকে এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

- একটি জাতির জাতিসত্তা তার জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চেতনার ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে সংস্কৃতির প্রতিটি কর্মকাণ্ড জাতিসত্তার আলোকে গড়ে উঠবে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিশেষভাবে এ দিকটি সামনে রাখতে হবে। কারা অধিকাংশ মানুষ আরোপিত সংস্কৃতিকেও নিজের সংস্কৃতি ভাবতে শুরু করে দিয়েছে।

- ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রতিটি কর্মীকে সংস্কৃতিবান ও পরিশীলিত সাংস্কৃতিক কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নয়; বরং সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

- চলমান সাংস্কৃতিক প্রবাহকে অনুধাবন করে তার মন্দ দিকসমূহ জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। সমস্ত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে এবং আগ্রাসী সংস্কৃতিকে সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে।

- ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে– বাংলাদেশে বিগত ৩০ বছরের প্রচেষ্টায় ৩০০-এরও অধিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। তারা কিছু কিছু কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে, কিন্তু বড়ো ধরনের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ চোখে পড়ে না। বড়ো বড়ো শহরে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে হবে। যেখানে অডিটোরিয়াম, প্রশিক্ষণ কক্ষ, সংগঠনের অফিসসহ বই-পত্রের দোকান থাকবে। আধুনিকতম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মীদের বসা ও আড্ডা দেওয়ার জায়গা, প্রকাশনা সংস্থাসহ এসব কমপ্লেক্স হবে আন্দোলনের এক-একটি কেন্দ্র।

- সাংস্কৃতিক কর্মীদের পেশাভিত্তিক সংগঠিত করতে হবে। কবি, লেখক, গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, গীতিকার, সুরকার, কলা-কুশলী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের পেশাজীবী সংগঠন বা ফোরাম গড়ে তোলা যায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- আমাদের ঐতিহ্য ও সমকালীন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। নবান্ন উৎসবের পুঁথি পালা, জারি-সারি, পল্লিগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, মুর্শিদি সুরে কি মানুষদের জাগানো যায় না? সুকৌশলে এসব অনুষ্ঠানকে সেকেলে ও পরিত্যক্তরূপ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এসবের শুরু ও শেষে স্রষ্টার গুণকীর্তন ছিল। ছিল ঐতিহ্য বন্দনা। এসব পুরোনো কর্মসূচির সঙ্গে বর্তমানের কিছু কর্মসূচি মিলিয়ে গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় নতুন সাংস্কৃতিক প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

- সাংস্কৃতিক গাইড তৈরি করতে হবে। সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের একটি গাইডেন্সের অভাব বোধ করেন সব সময়। একসময় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছোটো হলেও একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক গাইড বাজারে এনেছিল। আজ আর তা নেই। বিষয়টি নতুন করে ভাবা যায়।

- কোনো কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আজকাল ব্যবসায় রূপ লাভ করেছে। কবি, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সব সময় পৃষ্ঠপোষকতাবিমুখি। যুগে যুগে রাজা-বাদশাহরা দাতা সংস্থাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের সৃষ্টির সাথে জনমানুষের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বিশ্বময় ইউনেস্কো, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, এশিয়াটিক সোসাইটি বা অনুরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান অনেকেরই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ভারতে বর্তমানে টাটা, আনন্দবাজার ও অন্যান্য বড়ো বড়ো ব্যবসায়িক গ্রুপ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো পৃষ্ঠপোষক। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক অখ্যাত রাতারাতি খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছে। আর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অনেক প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল ও আত্মনিবেদিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীকে অকালে ঝরে যেতে বা আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখা যায়।

বই প্রকাশ, গুণগত মানসম্পন্ন গান, নাট্যধর্মী গান (মিউজিক ভিডিও), শর্টফিল্ম, নাটক, ফিল্মসহ বিভিন্ন প্রডাকশন বের করা বা উচ্চতর গবেষণাকর্মের জন্য তাদের দিকে হাত প্রসারিত করার এখনই সময়। আগ্রাসী শক্তির ১০টি কাজ হলে আগ্রাসন প্রতিরোধকারীদের কাজ হওয়া দরকার ১১টি। কারণ, আমাদের আমাদের তুলনায় হাজার মাইল এগিয়ে আছে। আর আমরা পেছন থেকে দৌড় শুরু করে প্রথম হওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য

বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও জাতির ওপর বাইরের প্রবল ও সামগ্রিক প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে নয়া উদারনৈতিকতা (neo-liberalism) তার আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত, পরিবর্তিত ও প্রভাবিত করছে। শেকড়-বিচ্যুতির যে আয়োজন সাম্প্রতিককালে মানবসমাজ ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তাতে ঐতিহ্যকেন্দ্রিক আলোচনাটি জরুরি হয়ে পড়েছে।

সংস্কৃতির লক্ষ্য স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার জীবন শেষে পরকালীন জীবনের সাফল্য এবং যে স্বর্গ থেকে মানুষ বিচ্যুত হয়েছে, সেখানে ফিরে যাওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তুষ্টি অর্জনে পূর্ণতার প্রয়াসই সংস্কৃতি।

মানুষের ইতিহাস ও তার সংস্কৃতি সমান্তরালভাবে বেড়ে উঠেছে। 'ঐতিহ্য' বলতে মানুষের গৌরবময় ইতিহাসকে বোঝায়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় আমরা বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক যুগ অতিক্রম করে সামনে এগোচ্ছি, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে আমরা পশ্চিমা প্রভাবে ব্যাপক দেওলিয়াত্বের শিকার। Samuel Hungtington তাঁর *Clash of Civilisation*-এ যে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন, তা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এই সর্বব্যাপী দ্বন্দ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সাংস্কৃতিক লড়াই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটিই নয়া ক্রুসেড। এই ক্রুসেড থেকে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের বাঁচার বা আত্মরক্ষার উপায় একটিই। আর তা হচ্ছে– সমসাময়িককালের সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করা এবং তার আলোকে জাতীয় পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিবেচনা

সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানী এইচ.জে. লাস্কি। তাঁর ভাষায়-

'Culture is what we are. আমরা যা, তাই সংস্কৃতি।'

অপরদিকে E.B. Taylor-এর মতে–

'Culture is that complex whole which includes knowledge, art, moral law, custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of society.'

পশ্চিমের উপলব্ধি : ধর্মহীনতা ইউরোপ-আমেরিকা এবং তাদের অনুসারী সমগ্র জনপদে অশান্তি, দুর্গতি ও অব্যবস্থার যে ভয়াবহ দৃশ্যপট রচনা করেছে, এ থেকে সবাই বাঁচতে চায়। ওরা বুঝতে পারছে, আধুনিক বিশ্বের শক্তিশালী মতবাদ 'জাতীয়তাবাদ'-এর ভিত্তিতে আর কিছু সময় চললেও আন্তর্জাতিক দুনিয়ার নেতৃত্ব সম্ভব নয়। তাই তারা নেতৃত্বের জন্য নয়া মেরুকরণ-সূত্র খুঁজে ফিরছে।

জার শাসকদের পতনের পর রুশ জাতীয়তাবাদ বিদায় নিলেও 'সমাজতন্ত্র' নিজেই একটি নতুন জাতীয়তার জন্ম দেয়। শতবর্ষ পূর্তির আগেই সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে এর সমস্ত আন্তর্জাতিক ফাঁকাবুলি প্রহসনে পরিণত হয়। কালোত্তীর্ণ নয় বলেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ঐক্যের সূত্র হিসেবে পরাজয় বরণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ তাই ডিজইউনিয়নের শিকার। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র মূলত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদেরই নামান্তর। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে এর শক্তিশালী বন্ধন রচনার ক্ষমতাই নেই। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে আন্তর্জাতিকীকরণের যে প্রয়াস, তা মূলত বহুজাতিক কোম্পানি ও তার মালিক দেশসমূহের একচেটিয়া লাভের ধাপ্পাবাজি। দরিদ্র বিশ্বের মানুষের মুক্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এর কোনো ইতিবাচক কর্মসূচি নেই।

পশ্চিমের ধন্যবাদ পাওয়ার দরকার তার 'ওরিয়েন্টাল স্কুল' চালু রাখার জন্য। ওরিয়েন্টালিস্ট নাম দিয়ে তারা একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের লালন-পালন করছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাদের কাজ হলো বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ঘটনা প্রবাহের ওপর উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিশেষজ্ঞ মতামত গঠন ও চর্চা অব্যাহত রাখা। ওরা এমনসব ইতিহাস রচনা করে, যা সত্যের সাথে দূরতম সম্পর্কহীন। এমনসব সংস্কৃতির সন্ধান দেয়, যা মুসলমানদের ঈমান- আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক; এমনসব কাহিনি ফাঁদে, যা কল্পকাহিনি বই কিছু নয়। এ সবকিছুকেই তারা সমগ্র বিশ্বে একমাত্র সত্য বলে চাউড় করে দিতে উদ্যোগী হয়।

এরই ফলে তাদের দেশ থেকে (অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড) উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে (এমনকী ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে পড়েও) মুসলিম পণ্ডিতগণও ইসলাম-বিদ্বেষী ও আমলহীন হয়ে পড়েন। এটাই ছিল পশ্চিমের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উত্থান রুখবার অন্যতম প্রয়াস।

আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা এখানেই শক্তিশালী।

এসব বাঘা ওরিয়েন্টালিস্ট পণ্ডিতদের কাছে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে যাওয়ার আগে, আমাদের তরুণরা ইসলামের সঠিক পরিচয় লাভের সুযোগ পাওয়ায় তারা পশ্চিমাদের এই ষড়যন্ত্রটি বুঝতে পারেন এবং এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হন। এসব তরুণদের ভেতর দ্বীন প্রচারের এক অদৃশ্য আগ্রহ বিদ্যমান। তাই তারা ঈমানের সেই মরু-বিয়াবানে নিজেদের এক-একজন দায়ি হিসেবে সেট করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারাই পশ্চিমা বিশ্বে আজকে যে ইসলাম প্রবাহ তার স্থপতি ও রূপকার। আজ পশ্চিমের উপলব্ধি হচ্ছে- মুসলমানদের উত্থান ঠেকাতে তারা ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের বদ্ধ অর্গল ভেদ করে ইসলামের আলো পৌঁছে যাচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার লাখো বাসিন্দার হৃদয়ে। আর খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভবন আর ইউরোপের রাজপরিবারগুলোর অন্যতম আলোচ্য বিষয় এখন 'ইসলাম'। হোক তা নেতিবাচক অথবা ইতিবাচক; ইসলাম তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমের আর বোঝার বাকি নেই- এই শতাব্দী ইসলামের। ইসলামই তাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। আমেরিকান কংগ্রেস তাই ইসলামের এই উত্থান মোকাবিলার জন্য ১১ দফা কর্মসূচি নিয়েছে। সবগুলো কর্মসূচিই 'সুগার কোটেড'। এসব কর্মসূচির কোথাও সরাসরি ইসলাম-বিদ্বেষ নেই। নেই কোনো বাড়াবাড়ি; বরং মনে হবে পশ্চিমই যেন আজ ইসলামের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। 'মুখে শেখ ফরিদ, বগলে আধলা ইট'- এই নীতি গ্রহণ করে ওরা ইসলামের এই উত্থান রুখতে চায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নতুন ক্রুসেড

পশ্চিমা দুনিয়া মুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে এক নয়া ক্রুসেডে লিপ্ত। এই ক্রুসেডের সূচনা তারা করেছে নয়া উপলব্ধির আলোকে। নতুন মাত্রার এই ক্রুসেডের লক্ষ্য রাজ্যজয় নয়, রাজা জয়। দৈহিক সমর নয়, আত্মিক সমর। সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, সংস্কৃতি বিস্তার। নতুন এই ক্রুসেডে ব্যাপক ধ্বংসকারী মরণাস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে না; ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থনীতি ও মিডিয়া।

ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী মত-পার্থক্যসমৃদ্ধ খ্রিষ্ট সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি প্রয়াস তাদের রয়েছে। এমনকী এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের বাদ দিয়ে অন্যান্য কিতাবধারীদের একটি ঐক্যও লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে আইসিসির নির্দেশে 'মাদার তেরেসার' মতো অসংখ্য মাদার কিংবা ব্রাদার তারা জন্ম দিয়েছে, যাদের সেবা ও কল্যাণ কর্মের আড়ালে সদা-সক্রিয় চালিকাশক্তি অন্তহীন। একটিই লক্ষ্য-সদা প্রভুর রেজামন্দি, ঈশ্বরের সন্তুষ্টি। কোনো রকম বাছ-বিচার ছাড়াই তহবিল সংগ্রহ করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, শিক্ষাহীন, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুমুখী হত-দরিদ্র মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়ে পশ্চিমের সৃষ্ট এনজিওগুলো একহাতে ত্রাণ, আর অপর হাতে বাইবেল বিতরণের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

সংস্কৃতিতে নতুন ক্রুসেড

যেসব সাংস্কৃতিক উপাদান ইউরোপ-আমেরিকার পারিবারিক প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিয়ে সেখানকার সামাজিক স্থিতিশীলতার মূলে কুঠারাঘাত করেছে, যা তাদের মধ্যকার পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহ, দয়ামায়ার বন্ধনকে ধ্বংস করেছে; সেগুলোকে চিহ্নিত করে মুসলিম জনপদে পাচারের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। ডিশ-ইন্টারনেট, স্যাটেলাইটে সওয়ার হয়ে এগুলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে মুসলিম সমাজে। পশ্চিমের মতো আমাদের সমাজেও 'ফ্লু'র মতো ছড়িয়ে পড়েছে নগ্নতা-বেহায়াপনা-অশ্লীলতা। মা-বাবা-ভাইবোনদের বসে এসব উপভোগ করতে করতে আমরাও এর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছি। লেজকাটা পশ্চিম, আমাদের লেজকাটার যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমরা যেন তারই শিকার।

এই ক্রুসেডের সেনাপতিরা সদা-সর্বদাই বন্ধুরূপে আবির্ভূত হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারতীয় ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলিম শাসকদের ঘরে ঘরে নিজেদের লোক নিয়োগ করে পশ্চিম চমৎকার রোমাঞ্চ অনুভব করছে। আকবরসহ ভারতীয় অনেক মুসলিম শাসক যেমন হিন্দু সুন্দরী রমণীদের পাণি গ্রহণ করে তাদের নামমাত্র মুসলিম বানিয়ে ঘরের কর্ত্রী বানিয়ে দিয়েছিলেন, আজকের অনেক মুসলিম শাসকও সেভাবে তাদের ঘরে তুলে এনেছেন ইহুদি ও খ্রিষ্টান রমণীদের, যারা স্বজাতির স্বার্থ রক্ষায় পূর্ণশক্তি নিয়োজিত রেখেছেন।

আমাদের করণীয়

দুনিয়ার এই অবস্থাটি সামনে রেখে আজ আমাদের করণীয় নির্ধারণের সময় এসেছে।

ক্রুসেডপ্রবণ পশ্চিমা দুনিয়া, উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদে আক্রান্ত ভারত, কনফুসীয় আদর্শে ক্রমশ উদ্দীপ্ত চীনকে সামনে রাখলে আমাদের করণীয় স্থির করতে সময় লাগে না।

ইউরোপকেন্দ্রিকতা নয়; তাওহিদই ভিত্তি

ধর্মই যখন আগামী বিশ্বের প্রধান নিয়ামক, তখন আর ইউরোপ-আমেরিকাকে কেন্দ্র করে নয়; একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ নির্মিত হবে তাওহিদকে কেন্দ্রে রেখে। বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে, ততই স্রষ্টার একত্ব বড়ো হয়ে ধরা দিচ্ছে। এক বিশ্ব, এক ব্যবস্থা, এক জাতিতত্ত্বকে সামনে রেখে আমরা যে হিসাবটা সহজে দাঁড় করাতে পারি তা হলো– এক প্রভু, এক বিশ্বজগৎ। তাঁর দেওয়া বিধানই একমাত্র ব্যবস্থা এবং একটি মাত্র জাতি, তথা তাওহিদভিত্তিক মানবজাতিই কেবল আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীকে কল্যাণ ও সীমাহীন প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলামই সর্বাধুনিক। দেশ-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে এর অবস্থান, সমগ্র মানবজাতি এর লক্ষ্য। এ জন্য তাওহিদভিত্তিক ধর্ম ইসলামই কেবল আগামী পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার গ্যারান্টি হতে পারে। খ্রিষ্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের মর্মবাণীও কিন্তু তাওহিদ। তাওহিদকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। আগামী শতাব্দীকে পরিচালনা করতে হলে তাওহিদতত্ত্বের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(Tawhidi Doctrine) ভিত্তিতেই করতে হবে। তাওহিদভিত্তিক জীবনবিধান 'ইসলাম' মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বিবেচনা করে। বিধায় এর কোনো সিদ্ধান্তই মানবধর্মের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। মানুষের প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিধান এতে নেই। এ জন্যই মানুষের বাসযোগ্য একটি পৃথিবী রচনায় তাওহিদের ভিত্তি প্রয়োজন।

মুসলিম বিশ্বের প্রতি সদস্যকে এ জন্য গর্বিত ও আনন্দিত হতে হবে যে, তার জীবন তাওহিদকেন্দ্রিক। এ বিষয়ে সকল প্রকার হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলতে হবে।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা যেমন রোম-পারস্যের মানদণ্ডে নিজেদের মেপে দেখেননি; বরং আল্লাহর দেওয়া তাওহিদের পাল্লায় অন্যদের মেপে নিয়েছেন- আজকের মুসলমানদের ওই একটি বিষয়ে তাদের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। সংখ্যা ১২০ কোটি হয়েও সেই অল্পসংখ্যক তাওহিদ অনুসারী পূর্বসূরিদের মতো না হওয়ার কারণে সৃষ্ট হীনতা ও দীনতা দূর করার এটিই একমাত্র পথ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব

আজকের পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি ইউরোপ-আমেরিকার হাতে। অথচ জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস, নির্ভুলতম উৎস আল কুরআন। কুরআন থেকে তারা জ্ঞান তালাশ করে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক সময় কর্ডোভা, গ্রানাডা, বাগদাদ আর মুসলিম দুনিয়ার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দিত, আজ আবার সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বসে বসে অতীত কাহিনি চর্চা করে গর্বে বুক স্ফীত করা নয়; বরং মুমিনের হারানো সম্পদ 'জ্ঞান-বিজ্ঞান'কে ঘরে তুলে নিতে হবে। আজ যদি ইহুদি, খ্রিষ্টান কিংবা কোনো অজানা-অচেনা জনপদেও জ্ঞানের কোনো শিখা জ্বলতে দেখা যায়, তাকেই ছিনিয়ে এনে আমাদের আঙিনায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে। আদম (আ.)-এর সন্তানগণই জ্ঞানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং অবশ্যই আদম (আ.)-এর ঈমানদার সন্তানগণ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব ক'টি শাখার নেতৃত্ব হাতে তুলে নিতে হলে বসে থাকার দিন শেষ। জ্ঞানের ইসলামিকরণ (Islamisation of knowledge) প্রক্রিয়া, যা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে (পশ্চিমের সেবা-দাসরা মূলত অজ্ঞতাজনিত কারণে যা নিয়ে বিদ্রূপ-উপহাস করার দুঃসাহস করে যাচ্ছে), তাকে দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম পণ্ডিতগণকে বিষয়টি নিয়ে তৎপর হতে হবে। হীনমন্যতামুক্ত শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণকে পৃষ্ঠপোষকতার হাত প্রসারিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে কাজগুলো করতে হবে।

নতুন অর্থনৈতিক বিশ্ব কাঠামো

বিশ্বে ১২০ কোটি ভোক্তার (consumers) এক বিরাট শক্তি আমাদের। অথচ ইসলামি সাধারণ বাজার (islamic common market)-এর উদ্যোগ মাঠে মারা যাচ্ছে, আর আমাদের বাজারগুলো দখল করে নিচ্ছে অন্যরা। আমরা কেন বিশ্বের বিশাল বাজার হয়েও অন্যদের ফাঁদের পণ্যে সয়লাব হয়ে যাচ্ছি? কেন আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের পণ্য গ্রহণ করতে সাগ্রহে এগিয়ে যাই না? একদিকে রয়েছে সহকর্মী অনুভূতির (fellow feelings) অভাব, উম্মতীয় চেতনার (Ummatic feelings) অভাব, অপরদিকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে সামনে রেখে গুণগত উৎকর্ষতাসম্পন্ন পণ্য প্রস্তুতিতে পশ্চাদপদতা। এমতাবস্থায় কমন মার্কেট (common market) ধারণার আলোকে অর্থনীতির এক নতুন বিশ্ব-কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। আইডিবির ভূমিকা আরও বিস্তৃত ও ইসলামি ব্যাংকিং-কে আরও উৎসাহিত করতে হবে। সারা দুনিয়া সুদমুক্ত অর্থনীতির দিকে ছুটছে। আর এ অর্থনীতি আমাদেরই হাতে থাকতে হবে। ইহুদি ব্যাংক-বিমা সংস্থার মালিকরা ইউরোপ-আমেরিকায় সুদহীন ব্যাংক গড়ে তুলে আশাতীত মুনাফার (profit) সন্ধান পেয়ে, মুনাফার পুরোনো হাতিয়ার (Instrument) সুদকে পরিহার করে সুদহীন ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিষয়টি আজ মুসলিম দুনিয়ার শাসকদের ভাবতে হবে।

বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ-এর যে একচেটিয়া প্রাধান্য বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাজমান, তাকে মোকাবিলা করে ইসলামি অর্থনীতির কল্যাণকর কাঠামোর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা কোনো অভাবিতপূর্ণ বিষয় নয়; প্রয়োজন উদ্যোগ ও প্রয়াসের। শেয়ার বাজারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবসায়ীরা যে ধাপ্পাবাজি শুরু করেছে, তার মোকাবিলায় স্থিতিশীল একটি আন্তর্জাতিক money-market, money machanism গড়ে তোলার বিষয়টি মুসলিম দুনিয়ার অর্থ-বিত্তের মালিকদের ভেবে দেখতে হবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রযুক্তি, তথ্য-প্রবাহ ও মিডিয়া

এই শতাব্দী হলো সম্পূর্ণরূপে তথ্যের শতাব্দী।

তথ্য-প্রযুক্তি (Information technology) নির্ভর একটি বিশ্বসমাজ, যা বিশ্বপল্লি (Global village) নামে পরস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে তাদের হাতে, যারা এই প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকবে। মুসলিম দুনিয়াকে এই ক্ষেত্রে অনেক সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সেই অনেক আগে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির ঠিকই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর (MSC) গড়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতৃত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া সম্ভব ছিল। বিষয়টি পশ্চিমারা টের পেতে করতে পেরে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছিল।

মূলত এই তথ্যযুগে দাঁড়িয়েও মুসলমানদের নিজের বাড়ির খবর নেওয়ার জন্য নির্ভর করতে হয় পশ্চিমের ওপর। সত্তর দশকের শেষের দিকে ইসলামিক নিউজ এজেন্সি (INA) গড়ে তোলা হলেও তা অচিরেই অপুষ্টি ও অবহেলায় মৃত্যুবরণ করে। মিডিয়া-সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় আমাদের কোনো প্রচেষ্টা আর জিয়ে থাকেনি। আন্তর্জাতিক মিডিয়া ব্যবসায় এগিয়ে আসার মতো অন্তত একটি বহুজাতিক মিডিয়া ব্যাবসার মালিক হওয়ার মতো কোনো ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক উদ্যোগ কি কেউ কোথাও নিতে পারেন না?

আসুন, আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পরিবর্তে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। পৃথিবী অধীর আগ্রহে আমাদের নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। সেই বোধোদয় আমাদের হোক যে, আমরাই আগামী পৃথিবীর ত্রাতা। তাওহিদভিত্তিক আগামী পৃথিবীর রূপকার ও পরিচালক হিসেবে উম্মাহে মুসলিমার রয়েছে অনেক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রস্তুতি। অনেক ঘুমিয়েছি আমরা। এখন যুদ্ধের সময়, প্রস্তুতির যুদ্ধ চলছে চারদিকে। এই লড়াইয়ে, এই যুদ্ধে আমাদের জিততে হবে। যে নিজের সাহায্যে এগিয়ে আসে, রাব্বুল আলামিন তাকে সাহায্য করেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ললিতকলা ও দাওয়াত

ললিতকলা কী এবং কেন

সংস্কৃতির নানা রকম প্রকাশ আমরা লক্ষ করি। আমাদের প্রত্যহিক জীবনে যা কিছু ঘটে, তার ভেতর দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন হয়। চিত্রকলায়ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে, কিন্তু অবশ্যই তা সংস্কৃতির অন্য মাধ্যমের মতো মূর্ত নয়। সংস্কৃতির অনেক প্রকরণ ও বাহন রয়েছে। ললিতকলা সংস্কৃতির একটি বড়ো বাহন এবং এই বাহনের রয়েছে অনেকগুলো প্রকরণ।

আমরা ললিতকলার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকি গান, কবিতা, আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা, গল্প, সিনেমা, নাটক, টেলিফিল্ম, ডকুমেন্টারি, মূকাভিনয় প্রভৃতিকে। ললিতকলায় পারদর্শী কলাকুশলী তাদের দক্ষতা, নৈপুণ্য ও পারফর্মেন্স দিয়ে দর্শক ও শ্রোতার হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টি করে, তাদের প্রভাবিত, অভিভূত এবং বলয়ানুসারী করে। এদের আমরা পারফরমার হিসেবে চিহ্নিত করি। ললিতকলায় তিন শ্রেণির মানুষ যুক্ত হয়। যথা :

১. যিনি বা যারা এর আয়োজক
২. মিডিয়া মালিক এবং
৩. দর্শক-শ্রোতা।

এককথায় ভোক্তাশ্রেণি, আর যারা এর উৎপাদনের মূলশক্তি। যেমন : গায়ক, নায়ক, কলাকুশলী; এককথায় পারফরমার।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একসময় এটি ব্যাপকতা লাভ করার আগে এক থেকে জনে এবং জন থেকে গোষ্ঠী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পর্যায়ক্রমে তা অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং জন থেকে অনেক, দল থেকে জাতি এবং জাতি থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এখন এটি বিশ্বায়নের প্রবল ধাক্কায়, তথা-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে।

ললিতকলা এখন অন্যসব মাধ্যমের মতো জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বলা যায় অন্যগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। পারফরমাররা এখন অন্যের মডেল হচ্ছে। তারা দর্শক-শ্রোতা ও বিচারকের রায় নিয়ে বড়ো বড়ো পুরস্কার জিতছে। ললিতকলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারসমূহ চালু হয়েছে। যেমন– গ্রামি অ্যাওয়ার্ড, কান চলচ্চিত্র উৎসব, অস্কার অ্যাওয়ার্ড, যা আবার একই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতাকে বিবেচনায় রেখে করা হচ্ছে।

ললিতকলা ও দাওয়াত

মানুষকে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে কথা ও কাজ দ্বারা আহ্বান করাকে আমরা দাওয়াত হিসেবে চিহ্নিত করি। ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করার জন্যও এ দুটো প্রক্রিয়া সব সময় ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত মানুষ তার পছন্দের বিষয়কে অনুসরণ করে। অমুকের কথা, অমুকের হাসি, অমুকের পোশাক, অমুকের হাঁটা, অমুকের চাহনি– এভাবেই মানুষ বিভিন্ন পছন্দের মানুষের বিভিন্ন বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যাপকভাবে লোকেরা কোনো বিষয়ে অবহিত হয় প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে। আজকাল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া একটি বার্তা মুহূর্তেই কোটি মানুষের কাছে সচিত্রভাবে পৌঁছে দেয়। এই দুই মিডিয়ার পছন্দের বিষয়গুলো মানুষ প্রায় সময়ই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে থাকে। হয়তো দেখা গেল, একজন খেলোয়াড় ডাক্তারি পরামর্শে মাথার চুল চেঁছে ফেলেছেন। তার দেখাদেখি পরদিন হাজারো তরুণ চুল কামিয়ে ফেলল। এ ধরনের ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে মিডিয়া। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়ার এক অসুরীয় ক্ষমতা রয়েছে মিডিয়ার; যার হাত থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। আর আগেই বলেছি– মিডিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়গুলো ললিতকলাকেন্দ্রিক।

মানুষকে কোনো আদর্শের দিকে ডাকার জন্য ললিতকলার প্রয়োগ একটা সুপ্রাচীন বিষয়। যুগে যুগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, আক্রমণ করা, তিরস্কার করা অথবা অনুপ্রাণিত করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আমরা কবিতা আবৃত্তিকে দেখতে পাই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের লোককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা হতো কবিতায়। কবিতা দিয়েই অন্যদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার প্রথম প্রয়াস নেওয়া হতো। যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্যও তা ব্যবহার করা হতো। জন-মিলনের স্থানসমূহে কবিতা ছিল একটি বড়ো মাধ্যম। যেমন সেই জাহেলি যুগেও লোকেরা কবিতা লিখে কাবায় লাগাত আর অন্যরা তা দ্বারা উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হতো।

গান তো সব সময়েই একটি অগ্রগণ্য বিষয় ছিল। গানের সুর, তাল, লয় সব সময়ই হয় মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে, নয়তো অকল্যাণের দিকে ডেকে যায়।

এভাবেই দেখা যায়– ললিতকলার দিক ও বিভাগ দ্বারাই যেমন মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব, তেমনি সম্ভব অন্যায়-অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দেওয়া।

ললিতকলায় উৎকর্ষতা

যেহেতু আমরা এক তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে বাস করছি, সেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি– সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, রুচিবোধ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত ছাড়িয়ে যাওয়ার একটা মানসিকতা কাজ করছে সর্বত্র। টিকে থাকা ও বিজয়ের জন্য এখানে প্রতিনিয়তই উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। আর এটি কেবল অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত নয়। একটা বাণী প্রচলিত আছে–

> 'ধ্বংস তার জন্য, যার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে উত্তম হলো না।'

জেতার জন্য, বিজয়ের জন্য এখন সবচেয়ে বড়ো সূত্র হলো– অবিরাম ও অনিঃশেষ উৎকর্ষ প্রয়াস।

ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে পরিবর্তন হচ্ছে। এ পরিবর্তন চিরন্তন। এর ফলে পরিবর্তন আসছে ললিতকলায়ও। কারণ, ললিতকলার প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষের মান উন্নয়ন ও পরিশোধনের প্রয়াস। এ বিষয়ে সবিশেষ নজরদারি দরকার।

উৎকর্ষের বিষয়সমূহ–

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে উৎকর্ষতা

ললিতকলার ধরন ও প্রকরণে উৎকর্ষতা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১. স্টাইলে উৎকর্ষতা
২. চিন্তার উৎকর্ষতা
৩. উপস্থাপনে উৎকর্ষতা
৪. চরিত্র নির্মাণে উৎকর্ষতা
৫. বাণী ও বিষয়ে উৎকর্ষতা।

এসব বিষয়ে উৎকর্ষ অগ্রাধিকার পাওয়া দরকার।

উৎকর্ষের নানামাত্রিক দিক

কবিতা ও আবৃত্তি

এক. ললিতকলায় মানুষের প্রাচীনতম বিষয় কবিতা বা ছন্দবদ্ধ কথা।

বাংলাদেশের একজন কবি লিখেছেন–

'যে কবিতা ভালোবাসে না, সে মানুষ খুন করতে পারে।'

কবির এ কথা সত্য কি না জানি না, তবে এটুকু বুঝি– কবিতা মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। দেশ, জনতা, মানুষ, মানবতা, সুন্দর ও কল্যাণের বাণীই কবিতা।

মানব মনের ভাব 'কবিতা' বা 'ছড়া' হয়ে সহজেই বেরিয়ে আসে। সাহিত্যের সব নমুনাই কবিতায় মূর্ত হয়েছে। মা, বোন, নানা ও দাদুরা এখনও শিশুদের শোনায় একই কবিতা, একই ছড়া–

'আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।'

'ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই পালঙ নাই আসন পেতে বসো।'

কিংবা বিখ্যাত ইংরেজি ছড়া-

'Twinkle Twinkle Little Star
How I wonder what you are.'

আর কবিদের নিয়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা সূরা নাজিল করেছেন, যার নাম– সূরা শুআরা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই. আমরা জানি, আরবদের মাঝে এমন অনেক বড়ো বড়ো কবি ছিলেন, যাদের আজও বিশ্ব সাহিত্য স্বীকৃতি দেয় ও সম্মান করে। যেমন : ইমরুল কায়েসের কবিতা অশ্লীলতা ভরপুর হলেও কাব্য সুষমার জন্য আজও তিনি জগদ্বিখ্যাত। 'কায়েস'। তার সাবয়া মুয়াল্লাকা কাব্য বিচারের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যে কথা বলছিলাম, রাসূল ﷺ-এর যুগে আরবের লোকেরা কবিতা লিখত এবং তা কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখত। সে সময়কার অন্যতম প্রধান কবি লাবিদ এসব কবিতা দেখতেন এবং শুধরে দিতেন।

একদিন এক সাহাবি কুরআনে হাকিমের সূরা কাওসার কাবার দেয়ালে লিখে রাখলেন এবং অপেক্ষা করতে থাকলেন লাবিদের প্রতিক্রিয়ার জন্য। লাবিদ এলেন, থমকে দাঁড়ালেন এবং কয়েকবার পড়লেন অসাধারণ কাব্যময়, ছন্দময় পবিত্র বাণী।

'ইন্না আতইনা কাল কাউসার
ফাসাল্লিলি রব্বিকা ওয়ানহার
ইন্না শা নিয়া কা হুয়াল আবতার।'

কোনো খুঁত, কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলেন না তিনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করলেন এর ছন্দ ও কারুকাজ, কাব্য সুধা এবং সর্বোপরি বাণীর গভীরতা। নিজ থেকেই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, এ তো কোনো মানুষের কথা হতে পারে না। বদলে গেলেন লাবিদ। তিন লাইনের সূরার নিচে চতুর্থ লাইনে ভয়ে ভয়ে লিখলেন–

'লাইছ্য হাজা কালামুল বাশার।'
অর্থাৎ, 'না! এ কোনো মানুষের কথা হতে পারে না।'

কবি লাবিদের মতো সাহাবিদের মাঝে যোগ দিয়েছিলেন কবি হাসসান বিন সাবিত। তেমনি কবি ছিলেন হজরত আলি ؓ, মা আয়েশা ؓ, মা ফাতিমা ؓ। কবিরা স্বপ্ন দেখান, ভবিষ্যৎ নির্মাণের কথা বলেন।

রাসূলের ﷺ যুগে কবিরা তাদের কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতেন। হজরত আলি ؓ স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাতেন। অন্য যোদ্ধারাও স্বরচিত ও বিরচিত কবিতা আওড়াতেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ ছাড়া কবিরা তাদের কবিতার মাধ্যমে অতীতের ইতিহাস, কালিমা, দুঃ ইত্যাদির কথা তুলে ধরে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, রাসূল ﷺ-এর অসাধারণ গুণ উল্লেখ করে কুরআনের মহিমা তুলে ধরেছেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন। পরবর্তীকালের মুসলিম কবিগণও ইসলামের মহিমা প্রকাশ করেছে তাদের কবিতায়।

ইসলামের ইতিহাসে অমর কিছু কবির কথা আমরা জানি। যেমন : ইরানের কবি রুমি, শেখ সাদি, ফেরদৌসি, কবি আল্লামা ইকবাল। বাংলায়- নজরুল, ফররুখ, জসিম উদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, কায়কোবাদ, তালিম হোসেন সিরা বর্তমানের আল মাহমুদ। এঁদের কবিতা ইসলাম, মুসলিম শৌর্য-বীর্য এবং কাব্য মহিমায় অনন্য।

তিন. কবিতা ও আবৃত্তি-কে দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করতে হলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ রাখা দরকার।

কুরআন যেমন বলেছে-

> 'আর কবিদের তারাই অনুসরণ করে, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনি, যে, তারা প্রত্যেক ময়দানে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।'
> সূরা শুআরা : ২২৪-২২৫

এই মিথ্যাচার, শিরক, বিদয়াত, অশ্লীলতা ইত্যাদি থেকে কবিতাকে মুক্ত রাখতে হবে। অনেকে মনে করেন- কবি হলেই একটু স্বাধীনতা পেতে হবে, একটু অন্যায় আশকারা পেতে পারেন। কিন্তু, এ কথা মনে রাখা দরকার যে, কবি বলুন আর শিল্পী-ই বলুন অথবা একজন প্রেমিক-ই বলুন- সবাই আমরা মানুষ।

উৎকর্ষের সময় আমাদের মনে রাখতে হবে কবিতার ছন্দ, উপমা, ধরন, স্টাইল, বাণী ও রূপকে। একটি 'বালাগাল উলা বি কামালিহি' যেমন শেখ সাদিকে অমর করে রেখেছে, তেমনি বাংলা কবিতায় নজরুল তাঁর *বিদ্রোহী, মানুষ* কিংবা *খেয়াপারের তরণি*'র জন্য, ফররুখ *হাতেম তায়ি, সিরাজাম মুনিরা, সাত সাগরের মাঝি*'র মাঝে অমর হয়ে থাকবেন। এমনিভাবে বেঁচে থাকার মতো কবিতা লিখতে হবে। লক্ষ করুন, নজরুল এত যে শ্যামা সংগীত লিখেছেন, তবুও তাঁর একটি ভক্তিগীতি বা ইসলামি সংগীতে খুঁজে পাবেন না শিরকের কোনো অস্তিত্ব।

এ প্রসঙ্গে লেবাননের কবি খলিল জিবরানের কথা মনে পড়ছে। আপনি তাঁর কবিতা পড়ুন। সেখানে মানবতা, সৃজন ও সুন্দরের কথা পাবেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে উৎকর্ষের জন্য আমাদের কিছু করার আছে। আমাদের বেশি বেশি পড়তে হবে, অধ্যয়ন করতে হবে এবং ভাবতে হবে। সেইসঙ্গে লিখতেও হবে বেশি বেশি। একটি বিষয় বিবেচনা রাখা যায়। আল্লামা ইকবাল মাত্র ২৪২টি কবিতা লিখেছেন। এই স্বল্পপ্রজ কবি কিন্তু বিশ্বময় একইভাবে সমাদৃত এবং স্বীকৃত। মজার কথা হলো– প্রত্যেক মানুষ কৈশোর ও যৌবনে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নময়তা তাকে কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে হ্যাঁ, সবাই শেষ পর্যন্ত কবি হন না।

গান

ললিতকলার অন্যতম প্রাচীন, কার্যকর ও জনপ্রিয় মাধ্যম সংগীত। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনাসহ মনের ভাব প্রকাশের এত কার্যকর ও সহজ মাধ্যম আর হতে পারে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে রয়েছে গানের ভূমিকা।

সহজে মনের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য গানের প্রতি রয়েছে সব শ্রেণির মানুষের তীব্র আগ্রহ ও আকর্ষণ। গান তো আসলে কবিতা। গীতি কবিতা। তাল, লয় সংযুক্ত কবিতাই গান।

গানের আবার রয়েছে অনেক ফর্ম, অনেক প্রকারভেদ। পল্লিগীতি, দেশের গান, জাতীয় সংগীত, ব্লুক, জ্যাজ, পপ, একক সংগীত, দলীয় সংগীত, ব্যান্ড সংগীত, ঋণসংগীত, গণসংগীতসহ বিভিন্ন প্রকারের গানের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

গান মানুষের ভাবাবেগকে আপ্লুত করে। তাদের মনে ভাবান্তর ঘটায়, হৃদয় গভীরে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, কঠোরকে নরম করে, চিন্তাকে নতুন করে সাজায়। নতুন জাগরণ ও চেতনা সৃষ্টি করে। সকল প্রকার গান দাওয়াতের উপযোগী নয়। যেমন : ব্লুক, জ্যাজ, পপ, ডিসকো কিংবা প্রেমের গান দাওয়াতের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার মতো নয়।

উৎকর্ষ প্রসঙ্গ

আমরা যারা গানে ইসলামি একটি ফর্ম গড়ে তুলেছি, তাদের গান নিয়ে অনেক কথা আছে। গান গাইতে গিয়ে আমাদের সব সময় সাবধানে থাকতে হয়। এই সাবধানে থাকার বিষয়টি উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, বুদ্ধিজীবী ও জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রায় সময় বলতেন–

> 'কে তোমাদের সংগীত করতে বলেছে? অথচ, তোমরা তাল, লয় কিছুই বোঝো না।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্যারের মন্তব্যটি প্রান্তিক, কিন্তু এর কিছু বাস্তবতাও রয়েছে। আমার ধারণা, যে ইসলামি গানের দলগুলোর নেই, তা সঠিক নয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এলাকার বড়ো বড়ো সমাবেশে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সাইমুম, অনুপম, কলরব, নিরন্তর পাঞ্জেরী, বিকল্প ইত্যাদি শিল্পীগোষ্ঠী। কয়েকটি জনসভা, কয়েকশো বক্তৃতা যে চেতনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ, একটি সফল গান তাকে ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ।

নবি করিম ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছালেন, মদিনার শিশুরা তখন গানে গানে তাঁকে বরণ করে নিল– 'তলায়াল বাদরু আলাইনা, মিনসানিয়াতিল ওয়াদায়ি।' প্রতি বছরই রমজান শেষে ঈদ আসে, কিন্তু নজরুলের এই গানটিই যেন আমাদের ঈদের প্রতীক।

'ও মন রমজানেরই রোজার শেষে, এলো খুশির ঈদ।'

'দুয়ারে আইসাছে পালকি,
নাইওয়ারি যাও তোলো রে তোলো,
মুখে আল্লাহ রাসুল সবাই বলো।'

'আল্লাহ আল্লাহ তুমি জাল্লে জালালুহু,
শেষ করা তো যায় না গেয়ে তোমার গুণগান।'

'রুপালি নদী রে, রূপ দেইখা তোর হইয়াছি পাগল।'

'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান।'

এসব গান ছিল একসময় এ দেশের মানুষের কাছে আল্লাহ, রাসূল, পরকাল, আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে দাওয়াত পৌঁছানোর হাতিয়ার।

বর্তমানে এসবের পাশাপাশি নতুন নতুন সব অসাধারণ গান যুক্ত হয়েছে। নজরুল, ফররুখ, গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী মিঞা, আব্দুল লতিফ, আজিজুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, রুহুল আমিন খান রচিত ইসলামি ধারার গান সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। গীত হতে থাকে শহর-গ্রামের মাহফিল ও জলসায়।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রচিত হয় অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান।

'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।'

'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা,
আমরা তোমাদের ভুলব না।'

এ সময় রোমান্টিকতা ও স্বদেশপ্রেমবিষয়ক অসংখ্য শিল্প গুণসমৃদ্ধ আধুনিক গান বাংলা গানে সংযোজিত হয়। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবু জাফর, খান আতাউর রহমান, আব্দুল লতিফ, আজাদ রহমান, রফিকউজ্জামান, গাজি মাজহারুল আনোয়ার, লোকমান হোসেন ফকির, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মতো বিশিষ্ট গীতিকারগণ উঠে আসেন।

আশির দশকে বাংলা গানে নজরুল, ফররুখের ধারার গানের একটি ধারার সূচনা হয়। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নেতৃত্বে এ ধারায় যারা গান রচনা করেন, তাদের কয়েকজন হলেন– তফাজ্জল হোসাইন খান, রাশিদুল হাসান, চৌধুরী আব্দুল হালিম, চৌধুরী গোলাম মাওলা, আবুল কাসেম, গোলাম মোহাম্মদ, তারেক মনোয়ার, আবু তাহের বেলাল, জাকির আবু জাফর, আমিরুল মোমেনীন মানিক প্রমুখ। আইনুদ্দিন আল আজাদ, মুহিব খানও সাফল্য লাভ করেছে।

এদের রচিত গান গাওয়া শুরু হলো দেশের প্রতিটি অঞ্চলে, সাংস্কৃতিক মঞ্চে, মাহফিল জলসায়। বের হওয়া শুরু হলো অডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি নতুন ধারার গান। যারা গাইতে লাগল, তারা সেসব গানে যন্ত্র পরিহার করে বাণী ও সুরের লালিত্য, কোরিওগ্রাফ এবং উপস্থাপনার নতুনত্বের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে এটি আলাদা ধারা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

অতি সম্প্রতি কোনো কোনো শিল্পীগোষ্ঠী যন্ত্র ব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে। এর দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। ব্যাপক শাস্ত্রীয় প্রশিক্ষণ, রেওয়াজ ও অর্জন ছাড়া যন্ত্রের ব্যবহার তাদের স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করছে।

ফলে গানের উৎকর্ষের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় দৃষ্টিতে আনা জরুরি বোধ করছি–

- গানের বাণী সমৃদ্ধ করার সকল রকম সুযোগ এখানে রয়েছে–

'আল্লাহকে যারা বেসেছে ভালো
দুঃখ কি আর তাদের থাকতে পারে।

'তুমি রহমান তুমি মেহেরবান
আছ গাহে না শুধু তোমারই গুণগান।

'এখনও মানুষ মরে পথের পরে
এখনও আসেনি সুখ ঘরে ঘরে....
কী করে তাহলে তুমি নেবে বিশ্রাম
কী করে তাহলে ছেড়ে দেবে সংগ্রাম!'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সেই সংগ্রামী মানুষের সারিতে
আমাকেও রাখিও রহমান...'

'সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা
সোনা নয় তত খাঁটি,
বলো যত খাঁটি, তারও চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটি।'

এর মতো অনেক সুন্দর সুন্দর গান বাণীর ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

- পাশাপাশি খেয়াল রাখা দরকার সুর-বৈচিত্র্যের দিকে। সুরের নকল একটি অসাধু ও অসুন্দরের প্রবণতা। প্যারোডি এক বিষয়– আর সুরের নকল অন্য বিষয়। সবচেয়ে বড়ো কথা সিনেমার চটুল জনপ্রিয় গানের অনুকরণে গান রচনা ও সুরারোপ কখনো সুস্থতার পরিচায়ক নয়। তাল, লয় ও সুর-বৈচিত্র্যে অন্যদের ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস থাকা চাই। এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় প্রশিক্ষণ দরকার।
- গানের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যন্ত্র। সংগত যুক্ত হয়ে গানের বাণী হয় সংগীত। সংগীত কতটুকু আমরা এগিয়ে নিতে পারি? রাসূল আকরাম ﷺ-এর সময় তৎকালীন উন্নত বিশ্বে সংগীত ছিল। অথচ, রাসূল যন্ত্র-সংগীতকে উৎসাহিত করেননি। কেবল দফ জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার তিনি নিরুৎসাহিত করেননি। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি জনপদের ইসলামি চিন্তাবিদ ও ফকিহগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে রায় না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যন্ত্রের ব্যবহারে ব্যক্তিগত ও দলগত দায়িত্ব গ্রহণের ঝুঁকি নেওয়ার বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত রায় আসতে পারে ইসলামি সরকারের কাছ থেকে।
- সেক্ষেত্রে উৎকর্ষের অন্যদিক– কোরিওগ্রাফি, আলোর ব্যবহার, দলগত দৈহিক কসরত ইত্যাদি গানে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। হামদ, নাত, সারি, জারি, পল্লিগীতি, জীবনের গান, রোমান্টিক গান, দেশের গান, ভক্তিমূলক গান– ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎকর্ষেরও অনেক অবকাশ রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, ভক্তিমূলক গানের আবরণে শিরক বা জিন্দিক[১]কে কোনো অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না।

---

১. জিন্দিক হলো ওইসব লোক, যারা মুখে আল্লাহকে স্বীকার করলেও অন্তরে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অথর্ব ও নিষ্ক্রিয় মনে করে। এরা অনেকটা মুনাফিকদের মতো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাটক, সিনেমা

এ দুটো বিষয় ললিতকলার দুই শক্তিশালী মাধ্যম। জীবনের নানা রূপ-রস-গন্ধ-সুখ-দুঃখ ইত্যাদিকে কাছ থেকে দেখে তা দশজনের জন্য উপস্থাপনের অপূর্ব ক্ষমতা থাকে এর রচয়িতা, পরিচালক, প্রযোজক ও শিল্পীদের হাতে। আমরা আরবি সাহিত্যে তাওফিক আল হাকিম, বাংলায় নজরুল, আবুল ফজল, আসকার ইবনে শাইখকে নাটকে ইসলামের বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করতে দেখি। তারা ইতিহাস-আশ্রয়ী, সামাজিক বিষয়কে আশ্রয় করে নাটক লেখেন। এসবের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে অনেক নাট্যকার এগিয়ে আসেন।

সবাক সিনেমার যুগে এগিয়ে আসেন মিশর ও পরবর্তী সময়ে ইরানি ও তুর্কি পরিচালকগণ। দি ম্যাসেঞ্জার, উমর মুখতার -এর পথ ধরে আজকের অস্কার বিজয়ী ইরানি চলচ্চিত্র এগিয়ে আসে। উমর সিরিজ, দিরিলিস আর্তুগুলের মতো চলচ্চিত্রগুলো এরই ধারাবাহিকতায় নির্মিত হয়। এই মাধ্যমে চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ প্রক্ষেপণ, কোরিওগ্রাফি, দৃশ্যায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও উত্তরণ-উপযোগিতা নিয়ে কাজ করার রয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এ বিষয়গুলো নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত প্রদান মুশকিলের বিষয়।

উৎকর্ষের বিষয়

বিষয় নির্বাচন : Art for art sake না হয়ে তা হতে হবে Art for humanity sake। শিরক, বিদায়াত, সামাজিক বিচ্যুতি, লড়াই, নবি কাহিনি, ইতিহাস ইত্যাদি হতে পারে নাটক-সিনেমার অন্যতম বিষয়বস্তু। বিবেচনায় আনতে হবে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়ার মতো বিষয়বস্তুকে।

সংলাপ : নাটক ও সিনেমার সংলাপ জীবন থেকে নেওয়া হয়। অবান্তর, অপরিচিত সংলাপ সর্বজনবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো অবস্থাতেই অশোভন, অশ্লীল, অশ্রাব্য ও দুর্বোধ্যতায় আক্রান্ত সংলাপ দ্বারা শিল্পগুণ নষ্ট করা উচিত নয়। মাত্রাজ্ঞান সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মুদ্রাদোষ : নাটক-সিনেমায় দু-একটি চরিত্রের পরিস্ফুটনের জন্য মুদ্রাদোষের আশ্রয় নেওয়া হয়। এসব মুদ্রোদোষ নির্বাচনের সময় সতর্ক থাকা দরকার। অনেক সময় প্রতীকী অর্থে Heritage ঐতিহ্য বা উপস্থাপন করা হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোরিওগ্রাফি ও মেকাপ : নাটক-সিনেমায় এ দুটো বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোরিওগ্রাফির ক্ষেত্রে 'সতর'-এর বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। তবে চরিত্রের প্রয়োজনে মাত্রার মাঝে থেকেও পোশাক ডিজাইন করা যায়। সেট-এর ক্ষেত্রে প্রচুর উৎকর্ষের সুযোগ রয়েছে। রয়েছে আলোকসজ্জা, সংলাপ ও রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও।

এ ক্ষেত্রে মেকাপের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। ভাঁড় আর ভিলেনের মুখে দাড়ি আর টুপি দেখে মনে হয় এটিই যেন সত্যিকার চিত্র। ব্যাপারটি কি আসলেই তাই? 'মাটির ময়না'য় মাদরাসায় শিক্ষকের চরিত্র হননের যে অপপ্রয়াস, তা সত্যিই বিস্ময়কর। মেকাপের ক্ষেত্রে তাই মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক।
এ ক্ষেত্রে আধুনিক নাট্যরীতি, নাট্যকৌশলসহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও পারদর্শিতা অর্জন সময়ের দাবি। এ ক্ষেত্রে Fine Arts, Drama ও Cinematography-তে উচ্চতর পড়ালেখার কোনো বিকল্প নেই।

ইরানের নির্মাতাদের কথাই ধরুন। তারা আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল অবলম্বন করেছেন ঠিকই, কিন্তু বিষয় নির্বাচন, চরিত্র নির্মাণ, ঐতিহ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে উদাহরণ সৃষ্টিতে পিছপা হননি। কত ছোট্ট বিষয়কে কত নিখুঁতভাবে জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলে ধরা যায়, তারা যেন তার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তুর্কী সিনেমা দিরিলিস উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। তবে এ ক্ষেত্রে ভাববার অবকাশ আছে।

উৎকর্ষ ও উত্তরণের নিরন্তর প্রক্রিয়া

শিল্পকলাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ললিতকলার বিভিন্ন বিভাগে উৎকর্ষ ও উত্তরণ একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ার নাম। এ ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নচিন্তা অব্যাহত রাখা দরকার। সে জন্য দরকার শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ আর্কাইভ।

যারা উৎকর্ষের শীর্ষে যেতে চান, তাদের প্রচুর পড়তে হবে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত নাটক-সিনেমা, গান ও কবিতাসহ অন্যান্য বিষয়ে যেসব বই-পুস্তক পাওয়া যায়, তা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। প্রচুর শুনতে হবে। গান শুনে সুরের বৈচিত্র্যের সাথে, কথার ঐশ্বর্যের সাথে পরিচয় হওয়া ছাড়া নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়। শুনতে শুনতেই তৈরি হয় নতুন নতুন সুর ও বাণী। একইভাবে প্রচুর নাটক ও সিনেমা দেখতে হবে। যদি কেউ এ ক্ষেত্রে কাজ করতে চান,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেক্ষেত্রে বিশেষভাবে নাটক ও সিনেমার ভিভিডি দেখে কোথায় কোথায় অসংগতি তা নির্ণয় করা দরকার। দরকার উৎকর্ষবিষয়ক বিশেষ গবেষণার। প্রচুর রচনা করা ছাড়া উৎকর্ষ সম্ভব নয়। কবি নজরুলের সাড়ে চার হাজার গানের সবকটিই তো আর সমান মানের নয়। এসব নাট্যকার বা সিনেমা নির্মাতারও সবক'টি নাটক-সিনেমা উচ্চ পর্যায়ের নয়। প্রচুর লিখলে হয়তো দেখা যাবে– কালের বিচারে কয়েকটি উতরে যাবে। যেমন : বাংলা সিনেমা *পথের পাঁচালী* একশো সেরা সিনেমায় স্থান করে নিয়েছে।

শিক্ষার কোনো বয়স নেই। যারা শেখেন না, তারা উৎকর্ষতার দিকে এগোতে পারেন না। প্রচুর শেখা, প্রচুর লেখা, প্রচুর গাওয়া এবং ব্যাপক চর্চা উৎকর্ষ ও উত্তরণের একমাত্র পথ।

দাওয়াত : সকল কাজের প্রাধিকার

একজন মুসলিম শিল্পী, কবি, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যকর্মী শিল্পের জন্য শিল্প করেন না। কবিতার জন্য কবিতা লেখেন না বা আবৃত্তি করেন না। গানের জন্য গান লিখেন না, করেনও না। তার প্রতিটি সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে এসবের মধ্য দিয়ে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরা। যে গান দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক, যে কবিতা ইসলামের বাণী ধারণ করে না, যে নাটক-সিনেমা দ্বীনের বিরোধিতা করে বা তার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, তা যতই পুরস্কৃত হোক না কেন, তা তার হৃদয়কে প্রশান্তি দিতে পারে না।

তাই আজ ললিতকলার প্রতিটি শিল্পী-স্রষ্টাকে দাওয়াতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানাই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংস্কৃতি ও সরকার

সংস্কৃতি কী? আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় কী? সংস্কৃতির বিষয়-আশয় কী? সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও তার প্রতিকার কী? ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখালেখি হয়েছে। তবে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে আমরা আলোচনা করব সংস্কৃতির সাথে সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে–

মানুষের জীবনকে তার সংস্কৃতি থেকে আলাদা করা যায় না। E.B. Taylor এর মতে–

> 'Cultere is that complex whole which includes knowlege, art, moral law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.'

সংস্কৃতি হলো মানুষের ওপর ধর্মের কিংবা মানুষের ওপর মানুষের প্রভাবের ফল। আমরা এও বলতে পারি– সংস্কৃতি মূলত ব্যক্তিমানুষের বিশ্বাসের প্রতিফলন। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ একক ব্যক্তি আবার সমাজেরও একটি অংশ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অসমান্তরাল প্রভাব তার ওপর পড়ে। সংস্কৃতির বাহক মানুষ, আর সভ্যতার বাহক সমাজ; আবার দুটোই।

সংস্কৃতি হলো মানুষ হয়ে গড়ে উঠার আর্ট, অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা। আর সভ্যতা হলো পৃথিবীকে পরিবর্তন করার ধারাবাহিকতা। সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক স্বর্গজগৎ ও ইহজগতের সম্পর্কের ন্যায়। এখানেই মানুষ ও বস্তুর দ্বন্দ্ব।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বসনিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদ মরহুম ড. আলিয়া আলি ইজেত বেগোভিচ-এর *Islam Between East And West* গ্রন্থে তিনি এভাবে বলেছেন–

> 'ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধুলা, লোকজ সংস্কার, লোকগাথা, পুরাণগাথা, নৈতিক ও নন্দনতত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারি, জাদুঘর, গ্রন্থাগার, রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থা– যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য এবং তাঁর স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে, এগুলোই মানব সংস্কৃতির অখণ্ড ধারাচিত্র। যার শুরু স্বর্গে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি মানুষের মধ্যকার আদি যোগাযোগের সূত্রে। এ হলো এক প্রজ্জ্বলিত আলোকশিখার সাহায্যে অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অনতিক্রম্য এক পবিত্র পর্বতে মানুষের আরোহণ প্রচেষ্টার ছবি।'

যারা ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের কাছে সংস্কৃতি মানে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্যের আলোকে গড়ে তোলা জীবন। ইসলামি সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এতে খোদার মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিষ্ক্রিয় উপাস্যের মতো নয়; বরং দুনিয়াবি মত অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। রাসূল তাঁর প্রতিনিধি। কুরআন তাঁর আইনগ্রন্থ। এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। এ হচ্ছে একটি ব্যাপক জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত।

এ সংস্কৃতি কোনো জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়; বরং সঠিক অর্থে এটি মানবীয় সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি এক বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে। তার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হওয়ার মতো অনন্য যোগ্যতা।

সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এ সংস্কৃতি নিজের অনুবর্তীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। গড়ে তুলতে চায় এক সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Pure Society)। চায় এ সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সহনশীলতা, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, উচ্চাভিলাষ, সাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মরক্ষা, নেতৃত্ব, আনুগত্য, আইনানুবর্তিতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুণরাজি সৃষ্টি করতে।

এ সংস্কৃতির প্রত্যয়বাদই মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণাবলি সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচণ্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে।

রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি পরস্পর পরিপূরক। সংস্কৃতি পরিগঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুব বেশি না হলেও তাকে পূর্ণতা দান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সংস্কৃতি রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়, যেমন জীবনের অন্য বিষয়ে দিয়ে থাকে।

সরকারের কাজ

আধুনিক রাষ্ট্র সরকার তিনটি প্রধান কাজ করে থাকে– আইন প্রণয়ন, সুপ্রশাসন ও সুবিচার। ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টিসহ সকল প্রকার বিষয় এই তিনটি বিভাগের আওতায় পড়ে।

সরকারের কাজ একটি সুশীল সমাজ গঠন। সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সর্বোত্তম আইন প্রণয়ন, সুনাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত একটি দায়িত্ববান ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন গড়ে তোলা এবং সকল অবস্থায় সুবিচার নিশ্চিত করা একটি আদর্শ সরকারের দায়িত্ব।

ইসলামি সরকারের কাজ চারটি–

> 'আমি যদি পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সবকিছুর পরিণাম আল্লাহরই।'
>
> সূরা হজ : ৪১

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ চারটি কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে মানুষ একটি ইসলামি সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাবে। ইসলামি সংস্কৃতির পরিপূর্ণ অবয়ব নামাজে প্রতিফলিত হয়। আজান শুনলেই ব্যক্তির অনুভূতি, আজানের জবাব দান, পবিত্রতা অর্জন, নামাজের জন্য মসজিদের দিকে ছুটে চলা, নামাজিদের পারস্পরিক আচরণ, ইমাম ও মোক্তাদির সম্পর্ক, ইমামের ভুল হলে সংশোধন, নামাজান্তে দুআ, পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া– এসব এক নতুন সংস্কৃতির দিগন্ত উন্মোচন করে। ইসলামি রাষ্ট্রে সরকার নামাজ কায়েমের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করে। নামাজের মতোই একটি পবিত্র ভাবধারাসম্পন্ন সমাজ গঠনের উদ্যোগ নেয় সরকার। একইভাবে জাকাতভিত্তিক সমাজ কায়েমের দায়িত্বও সরকারের। সরকার যেকোনো মূল্যে প্রত্যেক ধনবানের কাছ থেকে পাই পাই করে জাকাত আদায় করে তা নির্দিষ্ট আটটি খাতে বণ্টন করে। এভাবে একটি কল্যাণময় দরদি সমাজ গড়তে ভূমিকা রাখে। সরকার যদি সৎ কাজের (যত সৎ কাজ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন) আদেশ ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে এবং অসৎ কাজের মূলোৎপাটনের সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে আসে, তাহলে সমাজ আপনা হতেই সুন্দর হতে বাধ্য।

আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের ধারক-বাহকগণ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণের পরও সেখানে মানুষের যে হাহাকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তার প্রধান কারণ– সুশাসন, সুকৃতি ও সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের অভাব।

এ অভাব কিন্তু বিত্তের নয় চিত্তের, অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের নয়; সামগ্রিক দৈন্যের। তাদের যেন সবই আছে, শুধু নেই হৃদয়ের প্রশান্তি। মানুষকে এক চমৎকার প্রশান্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা। শুধু আইন এ কাজ করতে পারে না। আইনের শাসন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর আর শাসন করতে পারে না। ব্যক্তি ও সমষ্টি তখন অকার্যকর হয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করতে পারে কেবল ধর্মীয় নৈতিকতাভিত্তিক সুশাসন।

গণমাধ্যম, সংস্কৃতি ও সরকার

গণ বা mass কথাটি বহুকাল ধরে বেশ জনপ্রিয়। গণমত (mass opinion), গণসংস্কৃতি (mass culture) ও গণমাধ্যম (mass media) শব্দবন্ধ হিসেবে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জনপ্রিয় হলেও এর কোনো সত্যিকার ভিত্তি নেই। গণমত যেমন কোনো মত নয়, তেমনি গণসংস্কৃতিও কোনো সংস্কৃতি নয়। কিন্তু গণমাধ্যম অবশ্য সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একশ্রেণির লোক প্রায়শ গণসংস্কৃতির কথা বলেন এবং সংস্কৃতিকে গণমুখী করার নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু গণসংস্কৃতির বিষয় হলো mass বা man mass।

একজন মানুষের আত্মা আছে, কিন্তু একদল লোকের চাহিদা ছাড়া কিছুই নেই। সকল সংস্কৃতি মানুষের লালিত সন্তান। সেখানে গণসংস্কৃতি হলো শুধু প্রয়োজন পূরণ বা চাহিদার জোগানদার।

লোকসংস্কৃতি (Popular and folk Culture) আর গণসংস্কৃতি এক নয়। লোকসংস্কৃতিতে চটকদারি নেই, রয়েছে স্বাতন্ত্র্য, খাঁটিত্ব ও প্রাণময়তা। লোকসংস্কৃতি সৃজন ও অংশগ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গণসংস্কৃতির মূল কথা হলো নিপুণতার সাথে অপরকে বশে আনা। নাচ-গান, ধর্মীয় আচার, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি একটি গ্রাম বা উপজাতীয় জীবনের সম্পদ। এগুলো তারা পরিবেশন করে এবং উপভোগ করে সকলে মিলে, অকৃত্রিম বন্ধন ও অনুভাবনা সহকারে। কিন্তু গণসংস্কৃতি উপভোগের ক্ষেত্রে মানুষ উৎপাদক ও ভোক্তা এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ কি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালাকে প্রভাবিত করতে পারে? পাঠকদের মাঝে কেউ কি পত্রিকার বিষয়বস্তুতে, উপস্থাপনাতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে?

তথাকথিত গণমাধ্যম– সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য সম্প্রচারমাধ্যম প্রকৃতপক্ষে গণবশীকরণেরই মাধ্যম। একদিকে গুটিকতক মানুষের সমন্বয়ে গড়ে তোলা সম্পাদকীয় অফিস, অপরদিকে লাখো-কোটি নিষ্ক্রিয় দর্শক, শ্রোতা, পাঠক। দ্বিতীয়পক্ষ উদ্দীপ্ত বা হতাশ যাই হোক না কেন, তার স্বভাবের মাধ্যমে মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যমসমূহ সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না, বেদনা ও তার সামগ্রিক বিষয়-আশয়কে শৈল্পিক উপায়ে উপস্থাপনের জন্য জন্ম নিয়েছে কবিতা, গান, নাটক, গল্প, চিত্রকলাসহ নানান বাহন ও ফর্ম। মিডিয়ার জন্ম মূলত একজনের অনুভবকে দশজনের কাছে উপস্থাপনের জন্য এবং দশজনকে তার সাথি করার জন্য।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিডিয়ার ক্রমবিকাশ হলে তা পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে জাতি, জাতি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এই হাতিয়ারের কাজ হলো মানুষের কাছে কোনো বিষয়কে গ্রহণীয় বা বর্জনীয় করে গড়ে তোলা।

প্রথমেই পৃথিবীতে ছোটো মিডিয়া বা প্রিন্ট মিডিয়ার জন্ম হয়। খবরের কাগজ, বই-পুস্তক হলো প্রিন্ট মিডিয়া। বিগত কয়েক দশকে গড়ে উঠেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। রেডিও, টিভি, ডিশ, ইন্টারনেট, অডিও, ভিডিও হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, যা বর্তমান দুনিয়ার শক্তিশালী হাতিয়ার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সাইবার দুনিয়া। এমনকী পরমাণু বোমার চেয়েও শক্তিশালী হাতিয়ার এই মিডিয়া। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার দুর্দান্ত ক্ষমতা রয়েছে এই মিডিয়ার।

এখন আর মানুষকে শাসন করার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এখন বৈধভাবেই মানুষের ইচ্ছাকে অবশ করে শাসন, শোষণ ও সত্যের বটিকা সেবন করিয়ে তাদের স্বচিন্তা ও মতামত গঠন প্রতিহত করা হচ্ছে। আর তা সম্ভব হচ্ছে গণমাধ্যম দ্বারা।

ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অবাস্তব বিষয়সমূহকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা গণমাধ্যমের একটি বড়ো পারঙ্গমতা। মিডিয়া সাম্রাজ্য দখল করে অন্যের সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশকে প্রভাবিত ও প্রতিহত করার পাশাপাশি চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

ইলেকট্রনিক যুগের মানুষ অবতীর্ণ হয়েছে মিডিয়া লড়াইয়ে। মিডিয়া লড়াইয়ের প্রধান বিষয় সংস্কৃতি। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহায়তায় পালটে দেওয়া হচ্ছে মানুষের বোধ-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানসহ সবকিছু।

যতই স্বাধীনতার কথা বলা হোক না কেন, একটি দেশের সকল মিডিয়ারই প্রধান নিয়ন্ত্রণ থাকে সরকারের হাতে। তাই কেবল সরকার চাইলেই যেকোনো দেশ সাংস্কৃতিক দেওলিয়াত্বের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। কেবল তারাই জাতির আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

আগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়ে কোনো জাতির ভাগ্যের ফায়সালা হতো। এখন দলে দলে যুদ্ধ হয়। তবে যুদ্ধটা হয় ভিন্ন রকম অস্ত্রের মাধ্যমে। ব্যালট এখনকার অস্ত্র। ব্যালটে একদল পরাজিত হয়ে, আসে অন্যদল। দেখতে দেখতে সকল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষেত্রেই বিজয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিজিতদের স্থান দখল করে। যাহোক 'সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বখ্যাত চিন্তাবিদ মরিয়ম জামিলা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের একটি চিত্র এঁকেছেন–

> 'বিজিতরা সব সময় বিজয়ীদের পোশাক, বিশ্বাস এবং অন্যান্য আচার-প্রথা অনুকরণের চেষ্টা করে। এর কারণ হচ্ছে– মানুষ সব সময় বিজয়ীদের কাছে প্রিয়পাত্র হতে আগ্রহী হয়। এটা দুই কারণে হয়। প্রথমত, বিজয়ীদের প্রতি শ্রদ্ধা। দ্বিতীয়ত, বিজয়ীদের মতো যোগ্যতার অধিকারী হলে তাদের পরাজয় হতো না– এই মনোভাব থেকে যোগ্যতা অর্জনের জন্য। এভাবে দেখা যায়– বিজিতরা পোশাক, অস্ত্রধারণ, যন্ত্রপাতি এবং জীবন ধারণের সকল পদ্ধতিতে বিজয়ীদের অনুসরণ করে। বস্তুত প্রতিটি দেশই তার বৃহৎ বিজয়ী প্রতিবেশীকে অনুকরণের চেষ্টা করে। স্পেনের মুসলমানরা বিজয়ী প্রতিবেশী খ্রিষ্টানদের অনুকরণ করেছে। খ্রিষ্টানদের পোশাক, অলঙ্কার, আচার-আচরণের বিভিন্ন দিক, এমনকী ঘরে ছবি রাখার ব্যাপারেও মুসলমানরা তাদের অনুকরণ করেছে। সযত্ন পর্যবেক্ষণে এই হীনমন্যতা সম্পূর্ণভাবে ধরা হবে।'

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য মিডিয়া এক অসাধারণ হাতিয়ার। এই পথটি অনুধাবনের পরই ইহুদি ও হিন্দুরা পৃথিবীর সব বড়ো বড়ো মিডিয়া মালিকানা অর্জন করে নিয়েছে ও নিচ্ছে। এখন তারাই মিডিয়ার মালিক, উৎপাদক ও প্রযোজক। আর মুসলিম দুনিয়া হচ্ছে এক বিরাট বাজার, ভোক্তা। একদিকে মুসলমানদের ওপর পরিচালিত সমস্ত দমন-নিপীড়নের সংবাদ ছেপে দিয়ে তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা; অপরদিকে ইসলামি আকিদা, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমূলে নষ্ট করার জন্য নিত্য-নতুন কর্মসূচি আকর্ষণীয় উপায়ে পরিবেশন করে যাচ্ছে। ফলে, এই মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে কখন যে নিজেদের অজান্তে মুসলিম জাতির অর্ধসচেতন মানুষ সাংস্কৃতিক অপমৃত্যুর শিকার হচ্ছে, তা বুঝতেই পারছে না। অতিসাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে– সৌদি সরকারের ১০০ সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইজরাইলি বিশেষজ্ঞদের হাতে দেওয়া।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংস্কৃতি : সরকারের ভূমিকা

একটি দেশের সার্বিক সিদ্ধান্ত সরকারের ওপর নির্ভরশীল।

একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকার কারণে সরকার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের মাঝে তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। সংসদে আইন প্রণয়ন করে কিংবা প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে সরকার যেকোনো বিষয় চালু বা বন্ধ করতে পারে। আধুনিক সরকার পদ্ধতিতে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী রাজার চেয়েও শক্তিমান ও ক্ষমতাধর।

সরকার সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। যেমন–

- আইন প্রণয়ন

ক. জীবনবোধ ও বিশ্বাসের আলোকে সংস্কৃতি গড়ে উঠে বিধায় সংবিধানে এর প্রতিফলন হওয়া জরুরি। সংবিধান সংশোধন পূর্বক 'আল্লাহর ওপর বিশ্বাস'-এর বিষয়টি যুক্ত থাকলে, সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহকে 'সকল ক্ষমতার উৎস' বলা হলে, ব্যক্তি ও সমাজের আচরণের ওপর সার্বভৌমত্ব (sovereignity) বিষয়ক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা ও বিশ্বাসের সাথে মানুষের মাঝে আল্লাহর ভয় থাকা না থাকা নির্ভরশীল। আর আল্লাহর ভয় থাকা না থাকার ওপর সৎ ও অসৎ কাজের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণ নির্ভর করে। সংবিধানে এ বিষয়টি কেবল সরকারই পরিবর্তন আনতে পারে।

খ. সরকার দেশের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন। এই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের মাঝে দেশপ্রেম, জাতি গঠন, শাশ্বত মূল্যবোধের উজ্জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক দৃঢ় বন্ধন নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রাখতে হবে। 'ভোগবাদ ও শিল্পের জন্য শিল্প নয়; বরং মহান মানবিক গুণাবলির বিকাশ এবং মানবতার জন্য শিল্প'–এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

গ. 'ব্লাসফেমি অ্যাক্ট'-কে সরকার সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃত করে বাস্তবায়ন করতে পারেন। আইনের ফাঁক গলে, তথাকথিত স্বাধীন মতামত প্রকাশের নামে যেন কেউ ধর্ম, দেশ, জনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পার পেয়ে না যায়। সেক্ষেত্রে উদারনৈতিক মতবাদের দেশ আমেরিকা বা ব্রিটেনের আইনকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামনে রেখেও চিন্তা করা যেতে পারে। সেসব দেশে তো কেউ বাইবেল, খ্রিষ্টধর্ম, যিশুখ্রিষ্ট বা চার্চের বিরুদ্ধে কথা বলে পার পায় না। এ আইনটি ভালোভাবে প্রণীত হলে এবং তা যথাযথ মেনে চললে আমরা অনেক সাংস্কৃতিক অনাচার ও অনাসৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারি। ভারতের মতো সমকামিতা আর পরকীয়া যেন আইনে গ্রহণযোগ্য হয়ে না পড়ে সেদিকে নজর রাখা দরকার।

● **গণমাধ্যম বা মিডিয়া**

ক. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার যে অসাধারণ ক্ষমতা, তা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। সাম্প্রতিক সময়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্ষেত্রে বিপ্লব ছাড়াও বাংলাদেশে অনেকগুলো (প্রায় ৪৪টি) প্রাইভেট টিভি চ্যানেল গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ বেতার ছাড়াও প্রায় ১৫টি বেতার চ্যানেল তৈরি হয়েছে। এতে মনে হচ্ছে, হয়তো একসময় বেসরকারি উদ্যোগই বড় হয়ে দেখা দেবে। প্রিন্ট মিডিয়াতে বরাবর বেসরকারি উদ্যোগই শক্তিশালী। কিন্তু এর মানে তো এই নয় যে, এসব মিডিয়ার ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বা থাকবে না।

প্রিন্ট হোক আর ইলেকট্রনিক হোক, মিডিয়ার ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন রয়েছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের যে লাইসেন্স দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে আরও যাচাই-বাছাই করে দেখা দরকার। পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের অনুমতি পেয়েই কেউ যেন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধি ও বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রবাহ সৃষ্টির জন্য লেগে না পড়ে, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

খ. সরকার নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার সামগ্রিক পরিকল্পনায় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। মিডিয়ায় নিয়োজিত উৎপাদক জনশক্তি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পারফর্মার ও কলাকুশলী, বাষ্টিক ও সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশ ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার পূর্ণ প্রতিফলন থাকা চাই। তাদের ব্যক্তিগত জীবনাচারকে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। পোশাক-আশাক, সম্বোধন-সম্ভাষণসহ সকল ব্যাপারে তাদের স্টাইল, ভোক্তাদের (দর্শক, শ্রোতা ও পাঠক) জীবনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। কেবল বিশেষ সময়ে (রমজানে) মাথায় কাপড় দেওয়া সংবাদ পাঠিকা আমরা দেখতে চাই না। আমরা একটি মুসলিম দেশে সব সময়ই এ অবস্থা কামনা করি। এ কামনা অন্যায় তো নয়ই; বরং এটিই একমাত্র বাঞ্ছনীয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ. মিডিয়ার কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত, দারসুল কুরআন, কুরআন তালিম, মাসলা-মাসায়েলের অনুষ্ঠান, যুগ-জিজ্ঞাসা, বিভিন্ন জাতীয় ও ইসলামি দিবসসমূহে গঠনমূলক ও শিক্ষণীয় অনুষ্ঠানমালার উপস্থাপনসহ নাটক, সিনেমা, গান-কবিতায় দেশপ্রেম, ধর্মপ্রেম, জাতি গঠনের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। কৃষি, ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প, সমাজসেবামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার, উন্নয়ন ও উদ্বুদ্ধকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতি গঠনে বিরাট অবদান রাখা সম্ভব।

● শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

ক. মানুষের জীবনকে আলোকিত করার জন্যই শিক্ষাব্যবস্থা।

বাংলাদেশের বিগত ৪৭ বছরের ইতিহাসে সকল সরকারের ব্যর্থতার কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা। এত দিনে শিক্ষা নিয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা কমিশন কম হয়নি। এরপরও আমরা যে তিমিরে, সে তিমিরেই রয়ে গেছি।

প্রত্যেকবারই আমাদের সরকারসমূহ বোতল বদল করেছেন, ভেতরের পানি বদলাননি। দেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যে পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা না হবে, সে পর্যন্ত এ থেকে তেমন কোনো ফলাদায় সম্ভব নয়। বাংলাদেশের শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি হওয়া উচিত আল ইসলাম।

সরকারকে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক, যুগান্তকারী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কেবল ধর্মবিষয়ক একশত নাম্বারের পাঠদান নয়; বরং সকল বিষয়ে ইসলামের আলোকে সমাধান দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক গড়ার যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মাঝে সংস্কৃতির মূল্যবোধসমূহ বিকশিত হয়। সুদকরা, ভেজাল মিশিয়ে লাভ-লোকসানের হিসাব যে শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ, সেখানে শোষণের হাতিয়ার সুদ বা গর্হিত ভেজাল-এর ব্যাপারে ঘৃণার মনোভাব জন্ম নেওয়ার কোনো কারণ নেই। সে জন্যই ইসলামকে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী সিলেবাস, কারিকুলাম ঠিক করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি, দেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে সহশিক্ষা কার্যক্রম ঠিক করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষকদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সময়ের দাবি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

● তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও শিশু মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়

ক. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূলতঃ উপর্যুক্ত চারটি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে জন্যই কর্মসূচি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই চার মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। কেবল সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমেই সীমিত অর্থ ও জনবলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব।

খ. তথ্য-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই যুগে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদকে এ আওতায় এনে মানুষকে সচেতন করার জন্য কর্মসূচি নিতে হবে। রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা এই মন্ত্রণালয়গুলোর অধীন। সরকারি এসব মিডিয়াকে প্রযুক্তি ও মানগত দৈন্যতা কাটিয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের স্থান করে নিতে হবে। সমন্বিত উদ্যোগ হলে দেশ ও জাতিগঠনমূলক মিডিয়া কর্মসূচি তৈরি ও এর স্পন্সর পেতে আর বাইরে যেতে হবে না।

গ. সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রয়েছে শিল্পকলা একাডেমি, ফিল্ম এফডিসিসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগুলোর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এসব প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে দেশের মানুষের বোধ-বিশ্বাসের বিপরীত সাংস্কৃতিক প্রবাহ সৃষ্টির জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন কতিপয় অতিকৌশলী সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী। তারা পশ্চিমা ও ভারতীয় সংস্কৃতির নির্লজ্জ অনুকরণের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন। বিভিন্ন শিল্পকলা একাডেমিগুলো এসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে নিজ দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই মোড়লিপনার অবসান ঘটানো এবং তার পরিবর্তে ইসলামি ও দেশীয় চেতনায় উজ্জীবিত গোষ্ঠীগুলোর সহায়তা করা উচিত। ফিল্ম সেন্সর বোর্ডসহ সেন্সরের দায়িত্বে নিয়োজিত বোর্ডগুলোর পুনর্গঠন, সেখানে উপযুক্ত লোকদের সন্নিবেশন এবং তাদের যথাযথ, নিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিশ্চিত করা দরকার। প্রচারের আগে সবগুলো চ্যানেল তাদের আমদানিকৃত সিনেমা ও বিদেশি প্রোগ্রামসমূহের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র নেওয়ার বিধানটি ভালোভাবে দেখা প্রয়োজন।

ঘ. ধর্ম মন্ত্রণালয় দেশের মানুষের মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রচনায় বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সর্ববৃহৎ প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে ইসলামের প্রচার, প্রসার, গবেষণা, ইসলামি বই-পুস্তক প্রকাশ, ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এটাই সরকারের সবচেয়ে বড়ো উদ্যোগ। এত সময় এই ফাউন্ডেশন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বেশকিছু কাজ করতে পারলেও এখন অনেকাংশেই ম্লান হয়েছে। মূলত সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে এমনটা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, কখনো কখনো ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেই এই কার্যক্রমকে খর্ব করার এবং ইসলামবিরোধী কিছু কার্যক্রম পাশ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সব ক'টি কার্যক্রমকে জোরদার করা প্রয়োজন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয়, জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোকে জোরদার করে থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এর কার্যক্রম বিস্তৃত করা দরকার। শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশে এটিই বাঞ্ছনীয়। এর সকল পর্যায়ের কার্যক্রমের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্তির জন্য স্থানীয় সমজাতীয় সংগঠনসমূহের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। কেবল প্রতিযোগিতার কমিটি, বিচারক ও প্রতিযোগী হিসেবে নয়; সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাদের অংশ থাকা চাই।

বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীন। অনুরূপ এর বিভাগীয় অফিসগুলোর অধীনে রয়েছে কিছু ঐতিহাসিক মসজিদ। যেমন চট্টগ্রামের শাহি জামে মসজিদ। জুমার দিনে এসব মসজিদের খুতবা বা ন্যূনপক্ষে বায়তুল মোকাররমের খুতবা রেডিও এবং টিভিতে সম্প্রচার হতে পারে।

৬. একটি সুন্দর, সুশীল ও সমন্বিত সমাজ গড়ার জন্য সরকার ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার আদলে মসজিদকেন্দ্রিক প্রকল্প (Mosque based community development program) নিতে পারে। এই প্রকল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গড়ে তোলা যায়। প্রথম পর্যায়ে দেশের প্রতিটি থানায় ২/৩ টি ভালো মসজিদকে এর আওতায় আনা যায় এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মসজিদই।

শিশুদের কুরআন শিক্ষা, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, আদব-কায়দা শেখানো, বয়স্ক শিক্ষা, মহিলাদের জন্য নানা রকম শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, সেনিটেশন সচেতনতা, বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনসহ বহু বিষয়কেই এর আওতাভুক্ত করা যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'ইসলামিক মিশন' কার্যক্রমকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর সঙ্গে নেওয়া যায়। এর সাথে থাকতে পারে সমাজকল্যাণের মন্ত্রণালয়ের অভাবীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প। ঋণ পাওয়ার শর্ত থাকতে পারে নিয়মিত নামাজে হাজিরা, ছেলেমেয়েদের এখানকার শিক্ষাকার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বাড়িতে সেনিটারি পায়খানার ব্যবস্থা করা ইত্যাদির আগ্রহ। পাশাপাশি এখানে একটি কমিউনিটি লাইব্রেরিও থাকতে পারে।

মসজিদকেন্দ্রিক এ রকম একটি উদ্যোগ নিলে এবং তা সমাজ উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হলে সমাজনেতাদের মসজিদমুখী পদচারণা বাড়বে এবং নিঃসন্দেহে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঘর মসজিদের সংস্পর্শে তাদের ভেতরেও মৌলিক পরিবর্তন আসবে। এ জন্য যেসব কমিটি হবে, সেখানে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ নেতৃবৃন্দের ও ইমাম সাহেবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রকল্প বেসরকারি উদ্যোগে গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব।

এজাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করলেই ধর্ম মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ইমাম সাহেব, কমিটি সদস্য ও সমাজকর্মীদের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে থানা থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা দরকার। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমিসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। সমন্বিত উদ্যোগ নিলে এসব প্রতিযোগিতা ব্যাপক ও কার্যকরভাবে আয়োজন করা যায়। প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি ও দলীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় নির্বাচন থেকে সকল বিষয়েই একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে। এটা যেমন দেখা দরকার, তেমনি বিষয় নির্বাচনে বাংলাদেশের শাশ্বত ঐতিহ্যের আলোকে কুরআন তিলাওয়াত, হামদ, নাত, দেশাত্মবোধক গান, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পালা ইত্যাদির প্রতিযোগিতা বাড়ানো দরকার।

ছ. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত হলেও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সরকারের একটি কার্যকর উদ্যোগ। শিশু একাডেমির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে– শিশুদের জন্য নানা রকম প্রশিক্ষণ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(গান, নাটক, চিত্রাঙ্কন, নাচ ইত্যাদি), থানা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা, শিশুতোষ পুস্তক প্রকাশ, শিশুপত্রিকা প্রকাশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ইত্যাদি।

শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাই ওদের জন্য শিশু একাডেমির কার্যক্রমকে আকর্ষণীয়, গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর করতে হবে। শিশু একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত, সুযোগ প্রাপ্ত এবং বিদেশে যাওয়ার জন্য মনোনীত কেউ-ই যেন একাডেমির কর্মকর্তা ও সরকারি আমলাদের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ, প্রকৃত প্রতিভাবানদের বঞ্চিত করলে জাতি বঞ্চিত হবে।

সরকার ইচ্ছে করলে শুধু শিশুদের জন্যই নয়; মা-বাবাদের জন্যও একটি সুন্দর উদ্যোগ নিতে পারে। শিশুরা যে হারে কার্টুন TV, Discovery, Natural Geographic—এই চ্যানেলগুলো পছন্দ করে, অনুরূপ একটি উপযোগী Children Channel চালুর উদ্যোগ নিলে তা ভালোই বাজার পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এতে করে তাদের খেলাচ্ছলে শিক্ষা ও গবেষণামুখী করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া শিশু একাডেমিতে মনীষীদের জীবনীসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকাশনা বাড়ানো দরকার। শুধু রূপকথার বই দিয়ে উপযোগী নাগরিক গঠন করা সম্ভব নয়। সংস্কৃতি ও শিশু মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে থাকেন এবং বিদেশ থেকেও অনেক দেশের শিশুরা এসে থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে কি না, বিদেশে আমাদের সংস্কৃতির সত্যিকার প্রতিফলন ঘটছে কি না, তা দেখা সরকারের একটি বড়ো দায়িত্ব।

বিদেশ থেকে যেকোনো সাংস্কৃতিক দল এলেই তা আমাদের সংস্কৃতির জন্য সহায়ক না-ও হতে পারে। এ বিষয়টিও সরকারের দেখার বিষয়।

সরকার মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহ থেকে বিভিন্ন অনুকরণীয় ও গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি আমদানি করতে পারেন। সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, ইরানসহ তুলনামূলক অগ্রসর ও আধুনিক মুসলিম দেশসমূহের রেডিও-টিভির প্রোগ্রাম এনে বা বাংলায় ডাবিং করে আমাদের মিডিয়ায় দেওয়া যায়। মুসলিম বিশ্বের দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্রও আমাদের দেশবাসীর সামনে আনা প্রয়োজন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংস্কৃতি ও বিপ্লব

'সংস্কৃতি আগে না রাজনীতি'– এ মর্মে একটি বিতর্ক দীর্ঘকাল ধরে হয়ে এলেও বোদ্ধা লোকজনের বুঝতে আর বাকি নেই যে, মানুষের ইতিহাস আর সংস্কৃতির ইতিহাস সমান দীর্ঘ। সে তুলনায় রাজনীতির ইতিহাস নবীন। সংস্কৃতি আগে বলেই আমরা বলে থাকি– রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture), একইভাবে ধর্মীয় সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সংস্কৃতি ইত্যাদি।

একটি সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব অপরিহার্য। তবে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবটি চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিগত শতাব্দীতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব করা হয়েছে, তাতে প্রচণ্ড রকম একনায়কত্ব, একদেশদর্শিতা, মানুষ হত্যা ও নির্যাতন স্থান পেয়েছে; রাশিয়া ও চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বলি হয়ে বহু বড়ো বড়ো বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী তাদের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। এ জন্যই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ বিপ্লব তার স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব হারিয়েছে।

ইসলাম যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলে, তা মূলত প্রণোদনামূলক (motivational)। মানুষের চিন্তার জগতে এক আল্লাহর ভয় সৃষ্টি, তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে কাজের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি, সব সময় মানুষের কল্যাণচিন্তা, সৎকাজের প্রতি আগ্রহ এবং অসৎকাজের প্রতি বিরাগ সৃষ্টি এর অন্যতম শিক্ষা। ফলে মানুষ যাই করে, আত্মোপলব্ধির কারণে করে। জোর করে তাকে বিরত রাখতে হয় কম; বরং সে স্বতঃস্ফূর্তই অকল্যাণ, খারাবি ও অন্যায়ের কাছ থেকে সরে আসে। এটি মানুষকে জ্ঞান অর্জন, নতুন নতুন আবিষ্কার, কুসংস্কার হতে মুক্তির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, যা তার মাঝে সৃষ্টিশীলতার এক ঝরনাধারার জন্ম দেয়।

ইসলামি সরকারের সর্বোত্তম কাল হচ্ছে নবি করিম ﷺ ও তাঁর ওফাতের পরের ৩০ বছর। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধব্যাপী বিস্তৃত মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগে সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সভ্যতার এক অত্যাশ্চর্য বিকাশ ঘটে। হজরত আলি তাঁর নাহজুল বালাগায় বলেন–

> 'হে লোকেরা! তোমাদের ওপর যেমন আমার অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে আমার ওপর তোমাদের অধিকার। আমার ওপর তোমাদের অধিকার হলো– আমি সব সময় তোমাদের পথ দেখাব,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপদেশ দেবো এবং তোমাদের কল্যাণ করব। আর সরকারি কোষাগার সমৃদ্ধ করে তোমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াব, তোমাদের অজ্ঞতা ও অন্ধকার থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক আচার-বিধি ও সুন্দর আচরণের চরম উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যাব।'

ইতিহাস সাক্ষী– বাস্তবে শাসকরা করেছেনও তাই।

বাগদাদ, কর্ডোভা, সমরখন্দসহ উল্লেখযোগ্য বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বিরাট বিরাট গণপাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ হাসপাতাল, গরম-ঠান্ডা পানির প্রবাহ ও সুগন্ধি আতর সমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত হাম্মামখানা, সকলের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনামলে সংস্কৃতির এক বিশাল বুনিয়াদ তৈরি করা হয়। ইউরোপের রেনেসাঁসের বহু বছর আগে ইউরোপীয়গণ সুশিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের জন্য মুসলিম দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে যেত।

ইসলামি সংস্কৃতির শক্ত বুনিয়াদ গড়ে তোলা ছাড়া কোনো কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব সম্ভব নয়। তাই অন্য সময়ের মতো বর্তমান সময়ের ইসলামি আন্দোলনসমূহ সংস্কৃতবান মানুষ তৈরির ওপর সবিশেষ জোর দিয়ে থাকে।

বর্তমান পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশের মতো বাংলাদেশেও একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় হয়ে এসেছে। মানুষের মাঝে ধর্মপ্রবণতা বেড়েছে, বেড়েছে ইসলামকে জানার ও বোঝার আগ্রহ; পরিবারসমূহে ছেলেমেয়েদের ইসলামি আদব-কায়দা শেখানোর ইচ্ছাও প্রবল হয়েছে। সর্বোপরি হাজারো অপপ্রচার ও অপপ্রয়াসের মুখেও মানুষ ইসলামি শক্তির পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে।

সরকার বদল

জনগণ ক্ষমতাসীনদের আজ্ঞাবহ– এই আরবি প্রবাদ ঐতিহাসিক সত্যের ওপর গড়ে উঠেছে। সরকার পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা যদি মনে করেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিরাজমান অশ্লীলতা-বেহায়াপনাকে দূর করে এখানে মানবিক ও ইসলামি সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবেন, তাহলে বিগত সময়ে গড়ে উঠা নষ্টামিকে আবর্জনার স্তূপে ঠেলে অতি অল্প সময়েই এখানে এক উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে যাবে। কারণ এ মাটি, এখানকার মানুষ সব সময়ই সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের জন্য প্রস্তুত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সরকারের কাছে গণদাবি উত্থাপন : সচেতন সমাজকর্মী ও জনগণ এই বিষয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করে সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সমাজ সংস্কার এটি আল্লাহরও তাগিদ।

> 'আর তারা পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ দেয়।' সূরা আসর : ৩

তথ্যসূত্র

- ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা : সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।
- Islam Between East and West: Alija Ali Ijet Begovich.
- মোকাদ্দিমা : ইবনে খালদুন
- সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয় : মরিয়ম জামিলা
- বাংলাদেশের সংবিধান
- শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বিভিন্ন সেমিনারের প্রবন্ধসমূহ
- Westerm Civilisation through Muslim Eyes: Sayid Mujtaba Rukni Musawi Lari.
- আল কুরআন, সূরা আল আসর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় পর্ব

জ্ঞানের শক্তি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহসের মন্ত্র

এক টুকরো আলো

আমরা প্রতিদিন সকালে সূর্য দেখি। সূর্যের লাল আভা বিদায় হওয়ার সাথে সাথে চারদিকে কোলাহলে মুখরিত। সবুজ প্রকৃতি আলোর ছোঁয়ায় হেসে ওঠে। পাখিরা কিচির-মিচির শব্দে জাগিয়ে তোলে ঘুমের পাড়া। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল দূরে থাকা সূর্য আমাদের জন্য আলোর প্রধান উৎস। কিন্তু যখন ক্রমাগত সূর্য দেখা যায় না, যখন ঘুটঘুটে অন্ধকার আমাদের ছেয়ে থাকে, তখন? তখন আমরা আলোর বিকল্প উৎস খুঁজি।

জানা কথা, মানব সভ্যতার উন্মেষ বা জন্ম হয় আলোর পরশে, আগুনের ছোঁয়ায়। আজ আমরা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে বসবাস করছি। বিজ্ঞানের ভাষায় আদিম যুগ, গুহাবাসের যুগ, পাথর দিয়ে শিকার করার যুগ, পাথরে পাথর ঘষে আগুন তৈরির যুগ, সেটি বিদায় নিয়েছে অনেক আগে। তারপর লৌহ যুগ, তাম্র যুগ, বিদ্যুতের যুগ পার হয়ে এখন অতিক্রম করছি আনবিক যুগ, তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। এখন আমরা এক মুহূর্তে ঘরে বসে দেখতে পাই দশ হাজার মাইল দূরে বাস করা প্রিয় স্বজনকে। বিজ্ঞান যতই সামনে যাক না কেন, আগুন ও আলোর ব্যবহার কমছে না। যেন যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার নিত্য সারথি এই আলো।

বিজ্ঞান বলে, ঘুটঘুটে গহীন অরণ্যের গুহাবাসী মানুষ তাপ, খাবার তৈরি ও আলোর উৎস হিসেবে প্রথমেই আগুন তৈরি করতে শেখে। সেই অগ্নিশিখাই সভ্যতার প্রথম প্রকাশ। এক টুকরো আগুন, তার শিখা ও আলোর মধ্য দিয়েই সভ্যতার জন্ম।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই আগুন আর আলোর সর্বাধুনিক রূপ হচ্ছে জ্ঞান। আজ জ্ঞানের অগ্নিশিখা পথ চলে মানুষ পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে মহাবিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাঁদ আর মঙ্গলে সে খুঁজে ফিরছে নতুন জীবন ও সভ্যতাকে।

এটাকেই আমাদের স্রষ্টা রাব্বুল আলামিন এককথায় বলেছেন–

'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সূরা আলাক : ১

'যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন তা, যা সে জানত না।' সূরা আলাক : ৫

এই জ্ঞানটাই সভ্যতার আলো। এই আলোই আমাদের পথ চলার সবচেয়ে বড়ো পাথেয়। এ নিয়েই আজ আমাদের কথা।

জ্বলে উঠার মন্ত্র

সবাই নিশ্চয়ই তুষের আগুন দেখেছি বা সে সম্পর্কে শুনেছি। বিশেষ করে বর্ষাকাল বা শীতকালে গ্রামে মাটির পাত্রে তুষ বা ছাইয়ের আড়ালে আগুন চাপা দিয়ে রাখা হয়। যখন আগুন জ্বালাতে হয়, তখন ছাইচাপা তুষে ফুঁ দিলেই আগুন জ্বলে ওঠে। সব মানুষের মাঝেই সে রকম সুপ্ত (latent) প্রতিভা (talent) বা উত্তাপ (heat) থাকে। চাপা থাকতে থাকতে এসব সুপ্ত প্রতিভা হারিয়ে যায়। কিন্তু একটু নেড়ে দিলে, একটু উসকে দিলে কিংবা একটু সুযোগ করে দিলেই এসব সুপ্ত প্রতিভা পূর্ণোদ্যমে জেগে ওঠে। একটু আলোর পরশেই যেন এরা হয়ে উঠে আলোকিত।

কিন্তু কোথায় পাব এই পরশ পাথর? পরশ পাথর বলতে কোনো কিছু কোনো কালে কেউ দেখেনি। এটি একটি কল্পকথা। কিন্তু মানুষের মাঝে কিছু অসাধারণ মানুষ থাকে, যাদের সংস্পর্শে গেলে অন্যরা জ্বলে ওঠে। সুন্দর হয়, আলোকিত হয়, উদ্ভাসিত হয়। তাদের হৃদয় আলোকিত, চরিত্র বিকশিত, মন পরিশুদ্ধ। ফলে যে কেউ তাদের সান্নিধ্যে গেলে প্রভাবিত, আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়। তাই এদের অনেক মানুষই পরশ পাথর বলে থাকেন। এদের পরশে মানুষ হয় খাঁটি মানুষ, খাঁটি সোনা।

কী থাকে তাদের কাছে? কোনো অলৌকিক মন্ত্র? নাকি কোনো অসাধ্য সাধন প্রক্রিয়া?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে জ্বলতে শেখে, জ্বালাতেও শেখে

জ্বলে জ্বলে মোম সমাইকে আলো দেয়, নিজে নিঃশেষ হয়েও অন্যদের আলোকিত করে। দেদীপ্যমান মোম আলো দিয়েই শেষ হয়ে যায় না; তার আগুন দ্বারা অন্যরাও জ্বলে ওঠে। আলোকিত মানুষ মোমের মতো। সে নিজে জ্বলে এবং অন্যদের জ্বলে উঠতে সাহায্য করে। কিছু কিছু মানুষ না নিজে জ্বলে, না অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে। এরা প্রতিদিন আকাশে সূর্য উঠতে দেখে, আলো জ্বলতে দেখে। কিন্তু সূর্যের মতো তারও যে জ্বলে উঠা দরকার, এটুকু বোঝে না। এদের বলা হয়েছে গাফিল বা বেখবর। কুরআন এদের সম্পর্কে বলেছে–

> 'এরা দেখেও দেখে না, শোনেও শোনে না, বুঝেও বুঝে না।'
> সূরা বাকারা : ১৮

এসব মানুষ দিয়ে পৃথিবীর কোনো কল্যাণ সম্ভব নয়। যে জ্বলতে পারে, জ্বলতে শেখে, সে জ্বালাতেও পারে, জ্বালাতেও শেখে। এ জন্য প্রত্যয় নিতে হবে, আপনার শক্তিতে আগে জ্বলে উঠতে হবে। কেউ জ্বলে উঠলেই তার দীপ্ত আলোয় অন্যরাও উদ্দীপ্ত হবে, জ্বলে উঠবে। তার একার আলোতে অসংখ্য মানুষ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আলোকিত হবে।

কোথায়, কী করে শিখি

মানুষ জন্ম সূত্রে শিখে আসে না। সকল প্রাণীর মতো আমরাও কিছু বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা নিয়ে জন্মলাভ করি। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর জন্য শেখার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। তাদের শিখন ও লিখন পদ্ধতি নেই। সাপের বাচ্চা ডিম থেকে ফুটলেই ফণা তুলতে শেখে, গরুর বাছুর জন্মের পরপরই লেজ তুলে দৌড়াতে পারে। এগুলো জন্মসূত্রে পাওয়া (Built in), কিন্তু মানুষকে আস্তে আস্তে সব শিখতে হয়।

আমাদের শেখার প্রথম জায়গা পরিবার, প্রথম শিক্ষক মা। তা ছাড়া পরিবারের বাকি সব সদস্যের কাছ থেকেও আমরা শিখি। একজন মানবশিশু প্রথমে দেখে, শোনে, কিন্তু এগুলো সে বলতে পারে না। চারদিকের লোকজন কী করে, কেমন করে, কাকে কী নামে ডাকে ইত্যাদি সব বিষয় দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে তার স্মৃতিতে সেগুলো স্থায়ী হয়ে যায়। আমরা দেখি, হঠাৎ সে মা, মা বলে ডাকছে কিংবা দাদা বলে শব্দ করছে। সে খাবারের নাম মুখে আনছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পানিকে সে মাম, মাম বলে বোঝাচ্ছে। এভাবে ধীরে ধীরে সে পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে প্রাকৃতিকভাবেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনেক কিছুই শেখে। এটাকে আমরা বলি learning by observing being a part of the society। সমাজের একজন হিসেবে দেখা, পর্যবেক্ষণ করে আস্তে আস্তে শেখা।

এ ছাড়া কেবল মানব সমাজেই পড়ালেখা শেখানোর আলাদা আয়োজন রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal Education), উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal Education) এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education)। সমাজ-সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ধীরে ধীরে জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন আয়োজন গড়ে ওঠে। বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক, পারিবারিক উদ্যোগে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও হাজারো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব না থাকলেও আমরা যে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে পড়ালেখা শিখেছি, ডিগ্রি অর্জন করছি– হয়তো এসব কিছুই হতো না। আমরা দেখছি সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে আমাদের জন্য শিক্ষার নানা রকম আয়োজন বাড়তে শুরু হয়েছে। আগে আমরা মক্তবে না গেলে কুরআন শিখতে পারতাম না, এখন ঘরে বসে অনলাইনেও তা শিখতে পারছি। আগে পড়তে হলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে হতো, কিন্তু এখন Online University-তেও ডিগ্রি করা যায়।

যাই হোক, শেখার জন্যই মানুষের নানা আয়োজন।

মানুষের আয়োজন থেকে যে শিক্ষা, তাকে অন্য কথায় বলা হয় পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা। এ পদ্ধতিতে অর্জন করা জ্ঞানকে বলে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। এ জ্ঞান সব সময় স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। জ্ঞানের আরেকটি উৎস হচ্ছে ওহি বা প্রত্যাদেশ। স্রষ্টা এ জ্ঞানের মূল উৎস। নবি ও রাসূলদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য জ্ঞান প্রেরণ করেন। এ জ্ঞান স্থির, অপরিবর্তনশীল। একে বলা হয় ওহিলব্ধ জ্ঞান।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ

সভ্যতার দুটো মৌলিক উপাদান। এর মধ্যে প্রধানটি হলো– শিক্ষাব্যবস্থা। জাতি বা রাষ্ট্র গড়ে উঠার জন্য সেখানকার মানুষদের চিন্তা-চেতনা, মন-মনন ও নৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষার আয়োজন গড়ে তোলা হয়। এ আলোচনা ভালো করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বোঝার জন্য শুরুতে মানুষের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিই। প্রতিটি মানুষের তিনটি সত্তা আছে। শরীর, মন ও আত্মা। শরীর বাড়ার সাথে সাথে আমাদের মনকেও বাড়াতে হবে, শুদ্ধতা আনতে হবে। এর সাথে সাথে বাড়াতে হবে আত্মার পরিধি। আত্মাকে করতে হবে বিকশিত, পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ।

এ জন্য দেশে দেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম অংশ হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম (Curriculum), সহশিক্ষা কার্যক্রম (Co-curriculum) এবং শিক্ষা কার্যক্রম বহির্ভূত (Extra-curriculum) বিষয়সমূহ। কারিকুলাম দেশ ও জাতির প্রয়োজনের আলোকে নির্ধারিত হয়। ৫০ বছর আগে বাংলাদেশের একজন শিশুর হাতে থাকত *বাল্যশিক্ষা* নামক একটি বই। কিন্তু এখন শিশু প্রথম দুবছর কোনো বই-ই পড়ে না। তার জন্য রয়েছে খেলতে খেলতে, দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে শিক্ষার আয়োজন।

শিক্ষার অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

'মানুষকে মানুষ করার আয়োজনের নাম শিক্ষা।'

আবার ইংরেজ কবি জন মিল্টন বলেছেন–

'মানুষের দেহ, মন ও আত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের নাম হলো শিক্ষা।'

তাই আজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষারও বিকাশ এবং প্রবৃদ্ধি ঘটছে। একজন মানুষ শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত যত পড়ালেখা করে, তাতে উদ্দেশ্য থাকে তার সমস্ত দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করা। প্রথমত তার দেহের দিকে খেয়াল রাখা হয়। তাকে সুষম খাবার খেতে বলা হয়, দেওয়া হয়। খেলাধুলা, ব্যায়াম, শরীরচর্চা, দৌড়-ঝাঁপ, সাঁতার ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করা হয়। কারণ, প্রথমে চাই সবল দেহ, সুস্থ মন। আবার বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে মনের নানা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করা হয়। তার মধ্যে মানসিক স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটে। পরিচয় হয় নৈতিকতা ও ধর্মের সাথে।

মানুষের আত্মার বিকাশ হয় ধর্মের সান্নিধ্যে। ধর্ম তাকে সত্য বলতে, মিথ্যা পরিহার করতে এবং মানবদরদি হতে সাহায্য করে। পাপ ও অন্যায়কে ঘৃণা করতে শেখায়। পুণ্য ও ন্যায়ের ওপর টিকতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কথাটিকে একজন ইংরেজ দার্শনিক Sir Stainly Pole সুন্দর করে বলেছেন। তাঁর ভাষায়–

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'If you teach your son 3Rs i-e Reading, Writing and Arithmatic and don't teach him the 4th R i.e Religion, definitely you will get a 5th R, i.e Rascality.
যদি আপনি আপনার সন্তানকে তিনটি "R" অর্থাৎ Reading (পঠন), Writing (লিখন) ও Arithmatic (অঙ্ক) শেখান এবং চতুর্থ "R" অর্থাৎ Religion (ধর্ম) না শেখান, তাহলে নিশ্চিত আপনি তাকে পঞ্চম "R" অর্থাৎ Rascality (বর্বরতা) শেখাবেন বা বর্বর হিসেবে পাবেন।"'

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা এর বাস্তবতা দেখতে পাই।

আজ আমরা যারা ছাত্র ও শিক্ষক, যারা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, আমাদের বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মায়েদেরও তা বুঝে নিতে হবে। তা নাহলে আমরা কেউ হয়ে উঠব কেবল গ্রন্থকীট (book worm), কেউ হয়ে উঠব ডিগ্রিধারী মানুষ বা অহংকারী, শিক্ষিত বর্বর।

এ পর্যায়ে আমরা ছাত্র ও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত মান নিয়ে কিছু কথা ভাগাভাগি করব।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

ভালো শিক্ষার দাবি হচ্ছে– ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে ভালো সম্পর্ক। মা-বাবা সন্তানকে জন্ম দেন। তার অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন। আর শিক্ষক পরম মমতায় এই শিশুটিকে ধীরে ধীরে একজন সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করেন। তার ভেতরে জ্ঞানের আলো বাড়িয়ে তোলেন। তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করেন, শেখান। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্র-শিক্ষক নির্দিষ্ট আয়োজনে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে একত্রিত হন। এর বাইরে শিক্ষক ছাত্রের ভালো-মন্দ, উন্নতি-অবনতি নিয়ে সময়ে সময়ে তার অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা করেন। একজন শিক্ষক মূলত একজন ছাত্রের ফে.ফি.গা (Friend, Philosopher and Guide) বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কই বলে দেয় জাতি তাদের কাছ থেকে কী পাবে।

ইংরেজি Student এবং Teacher শব্দ দুটোকে বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করে আমরা ছাত্র ও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত মান সম্পর্কে বুঝতে পারি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Student

S- Study (অধ্যয়ন)

অধ্যয়ন ছাত্রদের প্রথম ও প্রধান কাজ। বলা হয়, 'ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ।' ছাত্রের প্রধান তপস্যা হচ্ছে অধ্যয়ন তথা পড়ালেখা করা। প্রতিটি ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ক্লাস করতে হবে। ক্লাসে তিনটি কাজ–

১. উপস্থিতি (attendance)
২. মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের পাঠ গ্রহণ করা (attention) এবং
৩. ক্লাস টেস্ট ও শিক্ষকের প্রশ্নের সঠিক উত্তরদান (performance)।

এ তিনটি কাজ সঠিকভাবে হলে ক্লাসে ভালো করা সম্ভব। ফুটবল খেলায় যেমন গোল দেওয়াটা সাফল্যের মানদণ্ড, তেমনি ক্লাসে ভালো নাম্বার বা গ্রেড পাওয়া সেখানকার সাফল্য।

এ জন্য ক্লাসের বাইরে, লাইব্রেরি ও বাড়িতে পাঠ্যবই প্রচুর পড়তে হয়। নোট করতে হয়, লিখতেও হয়। অনেকেই দ্রুত লিখতে না পারার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে সব প্রশ্নের সঠিক ও মানের উত্তর দিতে পারে না। ফলে তার জীবনে আসে ব্যর্থতা বা Failure।

T- Truthfulness (সত্যবাদিতা)

যে সদা সত্য কথা বলে, সে সদাই বিজয়ী হয়। মিথ্যা বলা মহাপাপ। বলা হয় মিথ্যা সকল পাপের মা। একটি মিথ্যা ঢাকতে কমপক্ষে ১০০টি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সত্যবাদী মানুষের জীবনে ভয়, শঙ্কা ও পরাজয় আসে না। ছাত্র-ছাত্রীরা ছোটোবেলা থেকে সত্য বলতে বলতে জীবনের সকল জায়গায় সত্যের ওপর টিকে থাকতে শেখে। আমরা মিথ্যাবাদী রাখালের গল্প জানি। মিথ্যাবাদীকে কেউই বিশ্বাস করে না। আবার সত্যবাদী বালক বায়েজিদ ও আব্দুল কাদির জিলানির গল্পও সবার জানা। মিথ্যার সাময়িক জয় হলেও চূড়ান্ত বিজয় কিন্তু সত্যেরই। কুরআনে বলা হয়েছে–

> 'আর সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। আসলে মিথ্যা তো অপসৃত হওয়ারই ছিল।' সূরা ইসরা : ৮১

U- Unity (ঐক্য)

ছাত্রজীবন থেকেই সবাইকে ঐক্যের গুণ অর্জন করতে হবে। সকল ভালো কাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সবাইকে নিয়ে চলতে শিখতে হবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ না থাকতে পারলে জাতি যেমন পিছিয়ে পড়ে, তেমনি মানুষ হিসেবে ঐক্যবদ্ধ না থাকলে পরিবারও পিছিয়ে পড়ে। আমরা জানি, দশের লাঠি একের বোঝা। বৃদ্ধ ও তার সন্তানদের গল্প সবারই জানা। একটা কঞ্চি যে কেউই ভেঙে ফেলতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে দশটা কঞ্চির গোছা কেউই একরকমভাবে ভাঙতে পারে না। এ জন্য বলে– একতাই শক্তি, একতাই বল। যে একা, সেই দুর্বল। দলীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে একতাবদ্ধ থাকা যায়।

D– Disicipline (শৃঙ্খলাবোধ)

প্রতিটি ছাত্র সব সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করতে শেখে। তাকে ব্যক্তিজীবনের শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। দিনশেষে সব কাজ গুছিয়ে সকাল সকাল ঘুমোতে হয়, আবার অতি প্রত্যুষে কাকডাকা ভোরে জাগতে হয়। ইংরেজিতে যেমন বলা হয়–

> 'Early to bed and early to rise, is the way to be healthy, wealthy and wise.'

নিজের বিছানাপত্র, বই-পুস্তক, কাপড়-চোপড় সবকিছু সুন্দর করে গুছিয়ে রাখার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। অন্যরা তাকে প্রশংসা করে। সময়মতো পড়াশোনা, খেলাধুলা, বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া এটাই হলো শৃঙ্খলা মেনে চলার লক্ষণ। প্রতিটি ছাত্র সময়মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে, নিয়ম মেনে হাজিরা দেবে, শ্রেণিকক্ষে নিয়ম মেনে চলবে– তাহলেই সবাই তাকে ভালোবাসবে।

মোটকথা, আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে হলে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই। সে জন্য বলা হয়– শৃঙ্খলাই জীবন, উচ্ছৃঙ্খলতাই মরণ। আমরা যেন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার জীবনযাপন করে অসময়ে মরণকে বরণ না করে বসি।

E– Enthusiasm (উদ্দীপনা)

জাতীয় কবি নজরুলের একটা গান আছে– 'ছাত্রদল'। তিনি লিখেছেন–

> 'আমরা শক্তি আমরা বল
> আমরা ছাত্রদল।
> মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
> ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছাত্র মানেই শক্তির প্রতীক, উদ্যম ও উদ্দীপনার প্রতীক। মরা, ম্রিয়মান মানুষ কখনো অন্যকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। তাই ছাত্র হিসেবে আমাদের সকল ভালো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। খেলাধুলাসহ সকল শিক্ষা কার্যক্রম, এমনকী বাইরের জগতের ভালো কাজসমূহ– সব ক্ষেত্রেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

N– Noblity (মহত্ব)

ছাত্রজীবন থেকেই আমাদের মহৎ গুণের অধিকারী হতে হবে। আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সবার জন্য করতে হবে। মহৎ গুণগুলো অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের জন্য কষ্ট হলেও করতে হবে। অন্যের দুঃখে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছোটোখাটো বিষয়ে মানুষকে ছাড় দিতে হবে। নিজের দোষ বড়ো করে দেখতে হবে। অন্য কেউ ভুল বা দোষ করলে, পারলে ক্ষমা করে দিতে হবে। কারণ, ক্ষমার চেয়ে মহৎ কোনো গুণ নেই।

T– Trustworthiness (বিশ্বস্ততা)

এখনকার দিনে কাউকে কেউ বিশ্বাস করাই দায়। মানুষ নিজেকেই বিশ্বাস করতে চায় না, অন্যকে বিশ্বাস করা তো অনেক দূরের কথা। ছাত্র হিসেবে আমাদের এই দুর্লভ গুণটি অর্জন করতে হবে। যে বিশ্বস্ত হতে পারে, সে মানুষের ভালোবাসা ও আস্থা পায়।

এভাবেই ছাত্র হিসেবে আমরা যদি ওপরের গুণগুলো অর্জন করতে পারি, তাহলেই আমরা পারব একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়তে। আমরা যেন সমাজ নামক দালানের এক একটি ইট। প্রতিটি ইট যদি সুন্দর, শক্ত ও মজবুত হয়, তাহলে আমাদের সমাজটিও হবে উত্তম, সুদৃঢ় ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য।

শিক্ষক : Teacher

ছাত্রদের যেমন অনেক নিয়ম-কানুন মেনে নিয়ে ভালো ছাত্র হতে হবে, তেমনি একটি ভালো জাতির কারিগর হিসেবে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদেরও হতে হবে অনুকরণীয়, আদর্শ মানুষ ও শিক্ষক। যারা আগামী দিনের দেশ ও সমাজ গড়ার কারিগর হতে চায়, এটি তাদের অনেক কাজে লাগতে পারে। Teacher শব্দটিকে ব্যাখ্যা করলে যা পাওয়া যায় তা হলো–

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

T– Truthful (সত্যবাদী)

শিক্ষক সত্যবাদী না হলে সাধারণত ছাত্ররা সত্যবাদী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। সে কারণে শিক্ষককে হতে হবে একনিষ্ঠ সত্যবাদী একজন মানুষ। তিনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবেন না, জীবন বিপন্ন হলেও সত্যের ওপর অবিচল থাকবেন।

E– Encouraging (উৎসাহদাতা)

একজন শিক্ষক সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবেন, তাদের ভালো কাজ করতে, সাহসের কাজ করতে এগিয়ে দেবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বড়ো হতে শেখে। একজন শিক্ষক কেবল পাঠ বিষয়ে নয়; বরং জীবনের সকল দুঃসাহসিক কাজে তাদের উৎসাহিত করে থাকেন। এতেই তাঁর সাফল্য। তাঁর এই মহৎ চেষ্টা ছাত্র-ছাত্রীদের বুকে সাহস, মুখে ভাষা আর চলার পথে গতি দান করে।

A– Admiring (বিস্ময়কর)

একজন শিক্ষক চলনে-বলনে, পোশাকে-আশাকে, চরিত্রে-মাধুর্যে হবেন এক বিস্ময়কর মানুষ। তাকে দেখলেই ছাত্র-ছাত্রীর চোখ আনন্দে বড়ো হয়ে উঠবে, মন অজানা আনন্দে ভরে উঠবে। তাঁর যেমন থাকবে হৃদয় উজাড় করা স্নেহ, ভালোবাসা, তেমনি থাকবে সময়মতো দৃঢ় শাসনের মনোভাব। তাই তো বিখ্যাত কথা, 'শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে গো।' এটি একজন শিক্ষকের জন্য সব সময়ই প্রযোজ্য হবে।

C– Caring (যত্নবান)

একজন শিক্ষকের কাছে ছাত্র হচ্ছে আমানত। অতি যত্নে তিনি তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। তার পাঠ্য বইয়ের পড়া থেকে শুরু করে সকল কার্যক্রম স্থির করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অনেক ভূমিকা থাকবে। একজন ছাত্রকে বার্ধক্যে এসেও বলতে হবে– হ্যাঁ, আমার এই প্রজ্ঞেয় শিক্ষকের কুশলদীন যত্নের কারণেই আজ আমি এ অবস্থায় আসতে পেরেছি।

H– Honest (সৎ)

শিক্ষক হবেন আপাদমস্তক একজন সৎ মানুষ। জীবনে কোথাও সততার বিনিময়ে কোনো কাজ তিনি করবেন না। সকল অসৎ প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকবেন। তাঁর জীবনের মূলনীতি হবে একটাই– Honesty is the best policy অর্থাৎ সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি। এটি তাকে সুখীও রাখে। ভালো শিক্ষকরা স্বাস্থ্য সচেতনও হয়ে থাকেন। এককথায় তিনি হন honest, happy and healthy।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

E– Empowered (ক্ষমতাপ্রাপ্ত)

একজন শিক্ষক কেবল দায়িত্বপ্রাপ্তই হবেন না; তিনি কিছু ক্ষমতাও হাতে রাখবেন। আমাদের দেশে দায়িত্ব ও ক্ষমতা পাশাপাশি অর্পিত হয় না বলে ছাত্রদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেকেই ভালো ভূমিকা রাখতে পারে না। শিক্ষাগুরু হিসেবে তাদের আমাদের সঠিক মূল্যায়ন, মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় হলো– 'শিক্ষকের মর্যাদা' কবিতাটি। শিক্ষকদের কিছুটা emotionalও হতে হয়।

R– Rewarding (পুরস্কার প্রদানে অভ্যস্ত)

শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের যেকোনো অর্জনে আনন্দিত হবেন। তাদের পুরস্কৃত করবেন। উৎসাহিত করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ যেন তাঁরই আনন্দ। আবার একইভাবে শিক্ষক হবেন reminder তথা তাগাদা প্রদানকারী। বারবার তাদের ভালো-মন্দ বিষয়ে সতর্ক করবেন।

শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো

পৃথিবীর সব দেশে, সব অঞ্চলে ধীরে ধীরে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে। সবখানেই শিক্ষার হার বেড়ে চলছে। বাংলাদেশে একসময় শিক্ষার হার কম ছিল। বিগত কয়েক দশক ধরে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে সরকারি, বেসরকারি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার কর্মসূচির কারণে এখন পুরুষ ও নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষার হার বেড়ে হয়েছে প্রায় ৭২%। তবে কথা আছে সেখানে। আমাদের শিক্ষার হার বলতে বোঝানো হয় যারা নাম-দস্তখত করতে পারেন তাদের হারকে।

কেবল নাম-দস্তখত করতে পারা মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বলা যায়, কিন্তু শিক্ষিত বলা যায় না। যথার্থভাবে আলোকিত বলা যায় না। আবার কেবল ডিগ্রিওয়ালা মানুষকেও বলা যায় না সঠিক মানের শিক্ষিত মানুষ। আগে আমরা 'শিক্ষিত বর্বর' কথাটি আলোচনা করেছি। ডিগ্রি বা পড়াশোনা যদি কারও আচার-আচরণকে পাশবিকতার হাত থেকে বের করে আনতে না পারে, তাহলে সে ডিগ্রিধারী, কিন্তু 'মানুষ' নয়। কারণ, তাঁর ভেতর প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ ঘটেনি, উন্মেষ হয়নি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজ ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালানোর দিন। একসময় ছিল-

'মাস্টার সাব, আমি নাম-দস্তখত শিখতে চাই,
কোনোদিন কেউ যেন বলতে না পারে,
তোমার ছাত্রের বুদ্ধি নাই... মাস্টার সাব।'

আজ সময় হয়েছে নতুন করে ভাবনার। আগে ছিল-

'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে।
জ্ঞানীজনে বলে- মূর্খ যারা, শুধুই তারা পড়ে গাড়ির তলে।'

এখন সে কথাও বদলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ডিগ্রিধারী মানুষের বাস ভারতের কেরালা রাজ্যে। তাদের শতকরা ৮০ জন মানুষ ডিগ্রি পাশ। সেখানকার শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সুবোধ, সজ্জন, ভদ্রলোক, মানবদরদি এবং সহজ-সরল। আমাদের শিক্ষিত সমাজের এক বিরাট অংশ ব্যাপক দুর্নীতি, অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরে ভরা। আজ দরকার নতুন এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের। আর তা হলো- আমরা প্রকৃত জ্ঞানে আলোকিত হব, নতুন এক পৃথিবী গড়ব।

সুশিক্ষা বনাম কুশিক্ষা

মানতে হবে জ্ঞানহীন জাতি অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। তারা সভ্যতার সংস্পর্শ পায় না। তারা সভ্যতা ও পৌরনীতিবোধ বিবর্জিত মহৎ গুণাবলি থেকে বঞ্চিত। সব সভ্য সমাজ, দেশ ও জাতি শিক্ষার হার বৃদ্ধির তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। বাংলাদেশও সেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। আমাদের শিক্ষার হার বাড়ছে, অর্থাৎ আমরা অশিক্ষার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সুশিক্ষিত নয়, সুন্দর মানুষ নয়। শিক্ষার মাঝেও রয়েছে সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা। এ জন্য আমাদের দুআ শেখানো হয়েছে-

'হে আল্লাহ! আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।' সূরা ত্ব-হা : ১১৪

বোঝা গেল, অকল্যাণ ও মন্দ জ্ঞান মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই সেটা অর্জন করতে বলা হয়নি। এ মন্দ জ্ঞানকে Evil Knowledge বা শয়তানি বুদ্ধি বলা যায়। শয়তান অনেক কিছু জানত, কিন্তু তার সেই জ্ঞান কারও কাজে লাগেনি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ জন্যই ওই জ্যানে যারা জ্ঞানী ও পণ্ডিত তাদের বলি কুশিক্ষিত, তাদের শিক্ষার নাম কুশিক্ষা। শিক্ষার নামে অনেক ক্ষেত্রেই কুশিক্ষার ব্যাপক চর্চা হয়। অঙ্ক কষাতে গিয়ে যখন লাভ-লোকসানের অঙ্কের নামে ভেজাল দেওয়ার পাঠ দেওয়া হয়, যখন সুদ কষার নামে মানবতাবিরোধী, রক্তচোষা সাইলকের মতো গরিবের গলায় পা দিয়ে সুদের টাকা আদায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়, যখন গল্প পড়ানোর নামে টোনাটুনির মানুষ ঠকানোর গল্প পড়ানো হয়– তা শিখে বা পড়ে মানুষ কখনোই সুশিক্ষা পেতে পারে না। তাদের মন পরিচ্ছন্ন হতে পারে না।

আমরা চাই সুশিক্ষা; কুশিক্ষা নয়। পশ্চিমের শিক্ষিত সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়– একদিকে তারা ঘরে কুকুর পালছে, কুকুরের নামে সম্পত্তি উইল করে দিচ্ছে, অপরদিকে বৃদ্ধ বাবা-মা বৃদ্ধাশ্রমে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তাদের পাশেই অসংখ্য অসহায় মানুষ না খেয়ে অবহেলায়, অপচিকিৎসায় জীবন হারাচ্ছে।

ওরা ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে মানবতামুক্ত বস্তুবাদী জীবনযাপন করছে। চারদিকে যেন Stainly Pole-এর ৫ম 'R' i-e Rascality বা বর্বরতার জয়-জয়কার।

সাহসের মন্ত্রপাঠ ও তিমির-বিনাশী গান

সাহসের মন্ত্র আবার কী? কে কার মন্ত্রে দীক্ষা নেবে?

সাহসের মন্ত্র কোনো অতীন্দ্রিয় বিষয় নয়। মানব সভ্যতায় যুগে যুগে মহাপুরুষরা এসেছেন সাহসের মন্ত্রে মানুষকে দীক্ষা দিতে। তাঁরা তাদের অপূর্ব সাহসের পরশে মানুষকে দানবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন।

এমন একজন অদম্য সাহসী দীক্ষাগুরু ছিলেন হজরত মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি অক্ষর-জ্ঞানহীন ছিলেন (illiterate), কিন্তু তিনিই ছিলেন সর্বকালের সেরা জ্ঞানী। *The Hundred* বইয়ের সংকলক Michel H. Herts বহু বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জীবনী গবেষণা করে একশত সেরা মানুষের তালিকা প্রণয়ন করেন। সেখানে সকল বিবেচনায় পৃথিবীর সেরা মানুষ, সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রথমেই স্থান পান মরুর দুলাল, আমিনার নন্দন, ইয়াতিম হয়ে জন্ম নেওয়া জনম দুঃখী হজরত মুহাম্মাদ ﷺ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজও পৃথিবীর দিকে দিকে অসংখ্য আলোর দিশারি মানুষের দেখা মেলে, তারা অসহায়ের বন্ধু, বিপন্ন মানুষের সহায়। তারা বুকে বুকে ছড়িয়ে দেন সাহস ও বিজয়ের মন্ত্র। একজন মানুষ ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের মরহুম রাষ্ট্রপতি, মিসাইলম্যান হিসেবেই যিনি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি জন্মেছিলেন ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের এক অজ-পাড়াগাঁয়ের কৃষক পরিবারে। তিনি নিজেই বলছেন–

> 'স্রষ্টা যেন আমার মতো এক অতি ক্ষুদ্র আব্দুল কালামের শরীর জুড়ে দিলেন একটি আগুনের ডানা (Wing of Fire)।'

তিনি আর কেউ নন, ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালাম।

আরেকজন হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। দীর্ঘ ২৭ বছর কারাবাস করেছেন। সংগ্রাম ও লড়াই করেছেন বর্ণবাদী শাসকের বিরুদ্ধে। অবশেষে তাঁর শেখানো মন্ত্রে জেগে উঠা সাহসী মানুষদের সংগ্রাম জয়ী হয়। পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখছে নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা, যা কালো তিমির বিনাশ করে মানবতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

এই গান গলায় তুলে, এই মন্ত্র বুকে নিয়ে আজ সবাইকেই চলতে হবে।

> 'তোমার আলোয় রাঙিয়ে দাও
> ঘুমের পাড়া জাগিয়ে দাও।'

সারা পৃথিবীতে এখন একটা অদ্ভুত প্রবণতা চলছে। মানুষ যেন দিন দিন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। আলগা হচ্ছে জাতি, সমাজ, মানবতা ও পারিবারিক বন্ধন। যৌথ পরিবার, একক পরিবারের ধারণার খপ্পরে পড়ে কোথায় যে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ!

তোমরা আজকের শিশু, আজকের কিশোর কিংবা যুবক। আগামীর সকল সম্ভাবনা তোমাদেরই মাঝে। সাহসের মন্ত্র বুকে যৌবনদীপ্ত তোমরাই হবে আগামী দিনের বাবা-মা। যদিও আজ তোমরা ছোটো, কিন্তু যেন একেকটা আগুনের ফুলকি। আলোর উৎস। তোমরাই সবার আগুনের পরশমনি।

কেবল নিজে বড়ো হলেই চলবে না। আশপাশের সবাইকে বড়ো করার মন্ত্র জাগাতে হবে। সেই ভদ্র সমুজ্জ্বল সুদিনের প্রত্যাশায় আকাশের দিকে হাত খুলে দাঁড়িয়ে থাকব আমরা। তোমার আলোয় পৃথিবীটা রাঙিয়ে দিও। তোমার প্রাণ চাঞ্চল্যের ছোঁয়ায় জাগিয়ে দিও সমস্ত ঘুমের পাড়া এবং ঘুমন্ত মানুষগুলোকে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি শিক্ষা আন্দোলন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ বিজিত অবস্থায় তাদের ওপর ঔপনিবেশিক শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা। বর্তমানে ৫৭টি স্বাধীন মুসলিম দেশের কোনো একটিও তাদের উপযোগী স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারেনি; বরং সামান্য অদল-বদল করে, কাঠামোগত পরিবর্তন এনে সাবেক প্রভুদের রেখে যাওয়া শিক্ষানীতির ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করছে। এটা অনেকটাই ইচ্ছাকৃত বা বেখেয়ালির দরুন। তবে এখন তারা চাইলেও এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। বিশ্বায়নের প্রবল জোয়ারে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের ফুরসত করতে পারছেন না শাসকগণ।

হজরত মুসা (আ.)-এর আগমন প্রতিহত করার জন্য ফেরাউন বনি ইসরাইলের ঘরে ঘরে ছেলে শিশুর জন্ম বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। ছেলে জন্ম হলেই তার নির্দেশে হত্যা করা হতো। কিন্তু যে শিশুর নাম মুসা, সে ঠিকই ফেরাউনের ঘরেই বেড়ে উঠেছিল। আমরা ইতিহাসের এই সত্য জানি। বর্তমান শতাব্দীর ফেরাউন, বিশ্বায়নের চমকানো স্লোগানের প্রকৃত প্রণেতা ইহুদিরা সেই ভুলটি করেনি। সে জন্য তারা শিশু হত্যা বন্ধ না করে শিশুদের মানুষ করার প্রক্রিয়া– শিক্ষা ব্যবস্থায় হাত দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার ও তার ওপর নিয়ন্ত্রণারোপ করার কাজটি তারা অতি গুরুত্বসহকারে করে আসছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৮৩৫ সালে উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপকার লর্ড ম্যাকলে এবং সমসাময়িককালে আরববিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের ইংরেজ শাসক লর্ড ক্রোমার একই সুরে কথা বলেছেন। তারা উভয়েই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন- 'এমন একদল লোক তৈরি হবে, যারা রঙে, বর্ণে হবে ভারতীয় বা আরব অথচ সংস্কৃতি ও আচরণে হবে ইংরেজ।' আজ অবধি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সফল হয়েছেন। ইংরেজদের এই সাফল্য যতটুকু, মুসলিম উম্মাহর ব্যর্থতা তার দ্বিগুণ। একদল মুসলিম শাসক ও চিন্তাবিদ বিজিত জাতির সনাতনি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ইংরেজদের একশত ভাগ অন্ধ অনুকরণ করেছেন। অপরদিকে একদল ওলামা-মাশায়েখ পরিবর্তনের হাওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে ওই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকে সমসাময়িককালে অচল একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখেছেন।

মূলত বিংশ শতাব্দীতে এসে মুসলিম মনীষার বোধোদয় হয়। একদল সচেতন মানুষ বুঝতে পারেন যে, মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে হলে তাদের আবারও শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞানমনস্কতায় এগিয়ে আসতে হবে। প্রচলিত বিবিধ ও দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি একমুখী, বাস্তবধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ও বাস্তবায়ন যে অপরিহার্য, এ বিষয়টি তাদের স্বীকৃতি লাভ করে।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

এক. এমন একদল লোক তৈরি করা, যারা হবে মূলত দোভাষী। ইংরেজদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও শাসনকার্যে স্থানীয় জনগণ ও তাদের মাঝে বোঝাপড়ার কাজটি আঞ্জাম দেবে।

দুই. এমন একদল লোক তৈরি করা, যারা নামে ও রঙে হবে ভারতীয়, কিন্তু সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক ও মূল্যবোধে হবে ইংরেজ। এরা হবে ইংরেজদের স্থানীয় প্রতিনিধি বা মানসপুত্র, যাতে তারা চলে গেলেও তাদের মতো করেই দেশ ও সমাজ পরিচালিত হয়।

তিন. ঘরে ঘরে বিভক্তি আনয়ন। একদিকে একদল ইংরেজি শিক্ষিত সাহেব তৈরি করা, যারা ধর্মীয় বিষয়ে থাকবে সম্পূর্ণ অজ্ঞ– অপরদিকে একদল ধর্মীয় শিক্ষিত লোক তৈরি করা, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক বিষয়ে অজ্ঞ থাকবে। এ জন্য তারা মাদরাসা ও টোলশিক্ষা ব্যবস্থাও চালু রাখে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইংরেজদের গোলামির জিঞ্জির ভেঙে ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে দু'দফায় স্বাধীনতা লাভ করলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী মানসিকভাবে তাদের (ইংরেজদের) গোলাম হতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে স্বাধীনতার পর (১৯৪৭) স্বাধীন দেশের উপযোগী করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের দাবি উঠতে থাকে। এরই সাথে সাথে দাবি উঠে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থারও।

মূলত পাকিস্তানের মতো একটি মুসলিম দেশ এবং এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও প্রয়োজনের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবি ছিল অপরিহার্য। এই দাবি আদায় হওয়ার আগেই সময়ের দাবি অনুযায়ী পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৮ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখানকার মানুষ পায়নি তাদের উপযোগী কোনো শিক্ষাব্যবস্থার সন্ধান। সেই শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে আজও সোচ্চার এই দেশ, এই জনতা।

ইসলামি শিক্ষার ধ্বংসলীলা

১৭৫৭ সালে ইংরেজরা বণিকের বেশ ছেড়ে শাসকের বেশ ধারণ করার সাথে সাথে মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। এরই অংশ হিসেবে মুসলমানদের জমিদারি কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি সরকারি চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয়। ব্যাবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদের পরিবর্তে হিন্দুদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মক্তব, মাদরাসা ও স্কুল পরিচালনার সাথে যুক্ত মুসলিম ধনী ব্যক্তিরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় ক্রমেই এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে বাধ্য হয়।

ইংরেজ শাসনের প্রথম একশত বছরকালে মুসলমানরা একদিকে শিক্ষা-দীক্ষায় ইংরেজদের বৈষম্যের শিকার হয়, অপরদিকে হিন্দু জমিদারদের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠা ইংরেজি স্কুলগুলোতে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের যাওয়ার পথও একরকম রুদ্ধ থাকে।

ইংরেজরা এসে দেখতে পায়– ভারতের কোর্টের ভাষা ফারসি। এ জন্য প্রথমে ইংরেজরা ১৮১৮ সালে ফারসি মাদরাসা স্থাপনের প্রয়োজনবোধ করে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের উদ্দেশ্য ছিল একদল কর্মচারী তৈরি। এই উদ্দেশ্যে এ সময়ে কলকাতা মাদরাসা স্থাপন করা হয়। ১৮২৬ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা মাদরাসায় ইংরেজি চালু করা হয়। ১৮৭৩ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে স্থাপন করা হয় অনুরূপ ৩টি মাদরাসা। এসব মাদরাসায় ইসলামি শিক্ষার বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে সেক্যুলার শিক্ষা চালু করা হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবের পর ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ-সংশয় বৃদ্ধি পায়। তারা মাদরাসাসমূহ বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সরকারি কাজে মাদরাসা শিক্ষিতদের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। ফলে একদিকে মুসলিমরা চাকরির আশায় সরকারি ক্ষেত্রে সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্তে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে, অপরদিকে নতুন মাদরাসা তৈরির কাজ স্তিমিত হয়ে আসে।

মুসলিম শিক্ষা আন্দোলন

প্রথম ধারা : ১৭৫৭ সালে পলাশির আম্রকাননে মুসলিম শাসনের পরাজয়ের পরই শুরু হয় মুসলমানদের নবতর প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতার লড়াই। এই লড়াইয়ের প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি। মুজাদ্দেদি আলফেসানির আন্দোলন থেকে মূলমন্ত্র গ্রহণ করে তিনি একদল চরিত্রবান, ত্যাগী ও কুরবানির মানসিকতাসম্পন্ন লোক তৈরির জন্য দিল্লিতে একটি বড়ো মাদরাসার জন্ম দেন।

এ মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসেন উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দেন। সৈয়দ আহমদ শহিদ, শাহ ইসমাইল শহিদ, বাংলার শহিদ তিতুমির ও হাজি শরিয়তুল্লাহ প্রমুখ। প্রায় একশত বছর ধরে সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তারা ইংরেজদের ভীত কাঁপিয়ে তোলেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবের পরপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং উপমহাদেশে সরাসরি রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাকামী জনতার ওপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিম রোলার। ফলে ১৮৭০ সালের দিকে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। এ কঠিন ও জটিল সময়ে আল্লামা কাশেম নানুতবি শাহ ওয়ালিউল্লাহর শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের গোড়াপত্তন করেন। পর্যায়ক্রমে সাহারানপুর, শাহি মুরাদাবাদ ও মিরাটে মাদরাসা স্থাপিত হয়। এসব মাদরাসার ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তারপরও বলতে হবে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে এদের অবদান অনেক বড়ো। গ্রামে-গঞ্জে এদের মন্ত্রে দীক্ষিত হাজারো আলেম-ওলামা দ্বীনি শিক্ষা ও জজবা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। এ ধারার শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িতদের একটি বিরাট অংশ জিহাদের পথ পরিহার করেন, পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করেন, যা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। পূর্বসূরিদের পথ থেকে তারা অনেক দূর সরে আসেন।

দ্বিতীয় ধারা : ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর মুসলমানদের মাঝে নতুন চিন্তা-চেতনার জন্মলাভ করে। সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জাতি গঠন, অধিকার আদায় ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমানদের এগিয়ে নেওয়া এবং নতুন ধারার আজাদি আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৮৬৩ সালে বাংলার নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' গঠন করা হয়। সিপাহি বিপ্লবোত্তর এটিই মুসলমানদের নিজস্ব প্রথম সংগঠন। হিন্দুদের একচেটিয়া ইংরেজ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সোসাইটি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ইংরেজদের আনুকূল্য লাভের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সময়ে মহসিন ফান্ডের টাকায় হুগলি কলেজকে সরকারিকরণ, কলকাতা মাদরাসার উন্নয়ন, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদরাসা স্থাপন এবং মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

একই সময়ে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসেন সৈয়দ আমির আলি, যিনি ১৮৭৮ সালে রাজনৈতিক সংগঠন 'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলির প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ শুরু করেন ঐতিহাসিক 'আলিগড় আন্দোলন'; যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের এগিয়ে নেওয়া। ১৮৭৫ সালে ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ডের অনুকরণে 'আলিগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করেন, যা পরবর্তী সময়ে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এসব আন্দোলন মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি, নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা এবং দেশে নতুন আইন-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে অন্য জাতি থেকে

পিছিয়ে না পড়ার চেতনা জাগিয়ে তোলে। যদিও এর মাধ্যমে কিছুটা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিকৃতি এসেছে দীনের ব্যাপারে।

এ পর্যায়ে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গড়ে উঠে কওমি মাদরাসা। অন্যদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা ও ইংরেজি ধারণ করে গড়ে উঠে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে ব্রিটিশের সৃষ্ট সরকারি মাদরাসা। পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা, যা পার্থিব জগতে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো একদল দীনি যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করবে, তা চালু করার কাজ হারিয়ে যায় ইতিহাসের অতল গহ্বরে।

ফলে ইংরেজদের 'ভাগ করো শাসন করো' নীতি বরাবরই বহাল থাকে। একদিকে একদল 'সাহেব', অপরদিকে একদল 'হুজুর' তৈরির কাজ অব্যাহত থাকে।

তৃতীয় ধারা : এ ধারাটি জন্ম দেন উপমহাদেশের ইসলামি আন্দোলনের বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্ব মাওলানা মওদূদী (রহ.)। ১৯৩৩ সালে তিনি তাঁর সম্পাদিত তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ-পরিক্রমা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সত্যিকার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব ও পরামর্শ পেশ করেন।

১৯৪০ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচি হলে 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংসদ' আয়োজিত ছাত্রসভায় বক্তব্য প্রদানকালে মাওলানা মওদূদী (রহ.) বলেছিলেন, 'যে ধরনের গাছ লাগানো হবে, সে ধরনের ফল পাওয়া যাবে।' তিনি শুধু মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমালোচক ছিলেন। বারবার তাঁর দাবি ছিল, আগামী প্রজন্মকে দেশের চাহিদা ও প্রয়োজনের আলোকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি পরিপূর্ণ ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের ওপর।

১৯৪১ সালে ৫ই জানুয়ারি দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা, লাখনৌর ছাত্র সমিতির অধিবেশনে মাওলানা মওদূদী (রহ.) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেখানে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করেন। এ ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৪ সালে ভারতের পাঠানকোটে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের গঠিত কমিশনের পক্ষ থেকে শিক্ষা সংস্কার ও উচ্চ শিক্ষার অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ করা হয়। যাহোক মাওলানা মওদূদী (রহ.) কর্তৃক প্রস্তাবিত 'পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা' বাস্তবায়নের সুযোগ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই দিনগুলোতে না থাকলেও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক স্বাধীন দেশের অস্তিত্বের সাথে তার সম্পর্কতা দেখা দেয়। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগণ সেদিকে নজর না দেওয়ায় জাতি তাদের কাছ থেকে আর কিছুই পায়নি; পেয়েছে বঞ্চনা, হতাশা ও অবিমৃষ্যতা।

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হয় এবং ১৯৪৯ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়, যা ১৯৫১ সালে রিপোর্ট পেশ করে। এভাবে ১৯৫৪ সালে আতাউর রহমান খান কমিশন, ১৯৫৮ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৬৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমান কমিশন, ১৯৪৩ সালে ড. এস. এম হোসাইনের নেতৃত্বে 'নতুন শিক্ষানীতি' নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয় এবং নুর খানের নেতৃত্বে 'নতুন শিক্ষানীতি' নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটি বিভিন্ন রকম প্রস্তাবনা পেশ করেন, যা অধিকাংশই শিক্ষা কাঠামোসংক্রান্ত। কিছু কিছু প্রস্তাবনায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গলদ তুলে ধরা হয় এবং ইসলামিয়াত চালু, মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইসলামি শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় চালুর প্রস্তাব করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব প্রস্তাব প্রস্তাবই থেকে যায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই সরকার ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশন ১৯৭৪ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। এ কমিশন একটি ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সুপারিশ করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫-এর পট-পরিবর্তনের ফলে এই জঘন্য সুপারিশমালা অকার্যকর হয়।

১৯৭৬ সালে ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্যভুক্ত করে। মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতঃপূর্বে মাদরাসা ছাত্ররা আধুনিক বিষয়সমূহ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৭৮ সালে ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এ পরিষদ একটি অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি তৈরি করে, যেখানে মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়।

১৯৮৩ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'মজিদ খান শিক্ষা কমিটি'। এটিও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ তুলে ধরে। এতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত আরবি ও ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়, যা ১৯৮৮ সালে রিপোর্ট পেশ করে।

১৯৯১-১৯৯৫ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হলো– 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ প্রণয়ন এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যক্রম জোরদার করা। ফলে বই-পুস্তকে ইসলামি ভাবধারার লেখা কমে যায়।

১৯৯৭ সালে সরকার প্রফেসর এম শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে, যারা ড. কুদরত-ই-খুদা প্রণীত ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থাকে সামান্য পরিবর্তন-পরিমার্জন করে বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। এ সুপারিশ বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বেই সরকার পরিবর্তন হয়।

মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা

প্রায় সমগ্র মুসলিম দেশেই মসজিদ গড়ে উঠেছে মুসলিম সমাজের প্রাত্যহিক মিলনকেন্দ্র হিসেবে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়ার মডেলে মসজিদ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ নেওয়া যায়। মসজিদকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা বা স্কুলপূর্ব শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে ইসলামি শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজ সহজ হবে। কারণ, দুই লক্ষাধিক মসজিদের সবকটিকেই স্কুল ভবনের মতো ব্যবহার করা সম্ভব।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

যেসরকারিভাবে বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার মতো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ প্রয়োজন। এ কাজটি কমবেশি সর্বত্র চলছে এবং অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামি শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজটিকে সহজ করে দেবে। অবকাঠামোগত এসব অগ্রগতি ইসলামি রাষ্ট্রকে প্রভূত সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দিতে পারে 'প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলীর অভাব'। এজাতীয় সংকট থেকে বাঁচার জন্য বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর ভেতর থেকেই ব্যাপক দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে একদল লোককে বেছে নিতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সাথে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসমান থেকে কতিপয় যোগ্য শিক্ষক নাজিল হবেন– এমনটা কখনোই হবে না। এ ক্ষেত্রে অতীতের চাইতেও বর্তমানের ইসলামপ্রিয় মানুষদের অবস্থান অনেক আশাপ্রদ।

ইসলামি রাষ্ট্র পূর্বশর্ত

তাত্ত্বিকভাবে আমরা যতই আলোচনা করি না কেন, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন অসম্ভব। রাষ্ট্রের আনুকূল্য ছাড়া শিক্ষা উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা, সিলেবাসভুক্ত বই-পত্র প্রকাশ, প্রয়োজনীয় শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্র কাঠামোরই একটি অংশ মাত্র। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষাব্যবস্থাও ইসলামি হবে। এখন প্রয়োজন এমন এক প্রস্তুতির, যাতে আমাদের ৪৭-এর স্বাধীনতাত্তোর পাকিস্তান, ৭১ এর স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ কিংবা একের পর এক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশগুলোর ভাগ্যবরণ করতে না হয়, যারা ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতায় সাবেক প্রভুদের গোলামির পরাধীনতা থেকে মুক্তি পায়নি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশ্বব্যাপী ইসলামি শিক্ষা আন্দোলন যে গতিশীলতা অর্জন করেছে, তাতে ইউরোপ, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে 'ইসলামিক কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। যুবকশ্রেণির মনে যেভাবে ইসলামকে জানার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে ইসলামি শিক্ষা আন্দোলনের সাফল্যই প্রমাণিত হচ্ছে।

আমরা আশা করি, ইসলামি শিক্ষা আন্দোলনের অব্যাহত ধারা বাংলাদেশে ইসলামি বিপ্লবের একটি সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা

ওপরের বক্তব্যসমূহের একটি নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ করলে ইসলামি শিক্ষা আন্দোলনের কতিপয় সাফল্যের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন :

১. সমালোচনার অভাব : সমালোচনাকে স্বাগত জানাতে হবে। ইসলামি শিক্ষা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বড়ো অংশ আত্মসমালোচনা ও বাইরের সমালোচনাকে সাগ্রহে নিতে প্রস্তুত নন। এমনকী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠা শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম, সিলেবাস, সংস্কৃতি ও পরিবেশ ইত্যাদিকে একমাত্র আদর্শ মনে করে অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। অথচ খোলাফায়ে রাশেদিনের পর চারজন বিশিষ্ট মাজহাবের বিকাশের সময় মহান ইমামগণ নিজেরা মত দিয়েছেন, কিন্তু অন্যের মতকে উপেক্ষা করেননি।

এ জন্য ইসলামি শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা, সেমিনার হওয়া দরকার। তাহলে চিন্তার বন্ধ্যাত্ব কিছুটা হলেও ঘুচবে, সমালোচনাকে গ্রহণ করার মতো মুক্ত মন তৈরি হবে, সর্বোপরি আত্মশুদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধতার দিকে আমরা ঝুঁকব।

২. আমলের ইসলামিকরণ : বৃহত্তর পরিসর ছাড়াও আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখতে পাব, একদল লোক তাত্ত্বিক দিক থেকে জ্ঞানের ইসলামিকরণে বেশ আগ্রহী। কিন্তু লোকেরা এসব তাত্ত্বিকদের ব্যক্তিগত আমল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শিক্ষার যে দুটো দিক 'ইলম' ও তরবিয়াহ', তার মাঝে যুগপৎ সমন্বয় না হলে আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। সকল যুগে অনুসরণীয়-অনুকরণীয় শিক্ষকগণই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিক্ষাকে অন্যের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছেন। এমন একদল শিক্ষক গড়ে তুলতে পারলেই তাদের সান্নিধ্যে অনুরূপ একদল অনুসারী গড়ে উঠবে।

সম্ভবত শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমেই এটা সম্ভব। বাংলাদেশে IES যতটুকু কাজ হাতে নিয়েছে, তা হয়তো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সহায়ক, কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তা মোটেও প্রযোজ্য নয়।

৩. **পাঠ্যবই রচনায় অনাগ্রহ :** আগ্রহ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা আন্দোলন বিস্তার, এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বাড়ার সাথে সাথে এ আন্দোলনকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে পাঠ্যবই তৈরি করা প্রয়োজন।

W.W. Hunter তাঁর *Indian Muslmans* বইতে ধর্মকে সহিষ্ণু করে উপস্থাপন করার কথা বলেছেন, যাতে মুসলিম তরুণরা ধীরে ধীরে ধর্মের ব্যাপারে অনাসক্ত ও অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। তারা মুসলিম তরুণদের জন্য আধুনিক শিক্ষা ও আরবি শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে এমনসব পাঠ্য তৈরি করলেন, যা আপাতত ও বাহ্যিকভাবে চমৎকার, কিন্তু এর ফল জাতির জন্য বিষময়।

ভেবে-চিন্তে লেভেলভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে যে মৌলিক পাঠ্যবই রচিত হওয়া দরকার, তা সব ক্ষেত্রে হচ্ছে না। বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান (Social Science)-এর বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। মুসলিম শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের এ ক্ষেত্রে একাডেমিক কাজে হাত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

মাঝপথে আবার বলে উঠলাম, ইসলামি ব্যাংকিং-এর ধারণা দেওয়া এবং সুদমুক্ত ব্যাংকিংকে জনপ্রিয় করার প্রাথমিক কাজটি সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.) তাঁর *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং* বইতে কিছুটা এনেছেন। তাঁর সেই বই বা ষাট-সত্তর দশকের লেখকদের বইগুলো কিন্তু বর্তমান ব্যাংকিং-এর বাস্তব দিকসমূহে একাডেমিক চাহিদা পূরণ করে না। এমনকী অর্থনীতির সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও সমস্যাসমূহের ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশনা দেয় না। এ ক্ষেত্রে যে কাজটা বিগত চার দশকে হয়েছে, তা আরও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বলছি, এখনও এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত পড়াতে গেলে মালয়েশিয়া থেকে প্রকাশিত কিছু সংখ্যক বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ ব্যবস্থাপনার প্রফেসর এ দেশে তো কম নেই। কষ্ট করে মৌলিক গ্রন্থ রচনার দিকে হাত বাড়াতে তারা নারাজ। এই অনাগ্রহ দূর করা সময়ের দাবি।

৪. **মডেল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা :** OIC-র শিক্ষা কমিটির সুপারিশে গড়ে তোলা ৪টি আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের অবস্থা আর বর্তমান সময় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– আস্তে আস্তে কোথায় যেন একটা সংকট তৈরি হচ্ছে।

মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার কথা থাকলেও তা পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি। IIUM এ ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর। সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এর বিশাল ক্যাম্পাস, অবকাঠামো গড়ে তোলা হলেও সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ থেকে জড়ো করা বিশিষ্ট শিক্ষকগণ আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছেন। বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের যে বিপুল সুযোগ দিয়ে পড়তে দেওয়া হতো, তা বন্ধ হয়ে যাওয়া শুভ লক্ষণ নয়। অপরদিকে বাংলাদেশের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়ে যে ষড়যন্ত্র চলেছে ও চলছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মডেল হিসেবে যেগুলো গড়ে তোলার কথা, সেগুলো আস্তে আস্তে হয়ে পড়ছে সেক্যুলার চরিত্রের প্রতিষ্ঠান।

ইসলামি শিক্ষা আন্দোলনের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন মডেল ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে যুগপৎ জ্ঞানের ইসলামিকরণ ও পরিবেশের ইসলামিকরণের কাজ বাস্তবায়িত হবে। সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো দিক থেকে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অপরিহার্য। বাংলাদেশের জন্য একটু আশার আলো IIUC। সময়ই বলে দেবে তা কতটুকু সফল।

৫. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর গবেষণার অভাব :** অভাব থাকলে স্বভাব বদলাবে না। ২ নং অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে একটু আলোকপাত হলেও এর বিস্তারিত আলোচনা দরকার। ইসলামি শিক্ষা বাস্তবায়নের আগ্রহী শিক্ষকদের সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এসব শিক্ষকদের উচ্চতর গবেষণার আয়োজন নেই বললেই চলে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেমন এটি দরকার, তেমনি দরকার জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়েও। মাঝে মাঝে আয়োজিত তিন দিনের ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ক্যাম্প কিংবা আলোচনাসভা দ্বারা এসব সম্ভব নয়। এ জন্য চাই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সরকারের BANBEIS, BE, ME কোর্সসমূহের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা লাগবে। বিদেশে গবেষণায় যাওয়ার জন্য সাপোর্ট তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। উচ্চতর গবেষণায় যেতে আগ্রহী মুসলিম তরুণরা দেশে সঠিক মূল্যায়ন (মর্যাদা ও অর্থনৈতিক) না পাওয়ার আশঙ্কায় বিদেশে থেকে যাওয়ার যে দুষ্ট প্রবণতা, তা রোধ করা অতীব জরুরি।

৬. **সমন্বিত প্রয়াস :** বিশ্বব্যাপী ইসলামাইজেশন আন্দোলনের তাত্ত্বিক সংগঠন IIIT দেশে দেশে পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনসমূহের বিভিন্ন Descipline-এর সংগঠনসমূহ (যেমন– পাকিস্তানের IPS, বাংলাদেশের IERB), শিক্ষাসংক্রান্ত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (IES, IIUC, Manarat), যেসব নিজ নিজ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ও করছেন, তার একটি সমন্বয় অবশ্যই প্রয়োজন। কাজ হচ্ছে অনেক, কিন্তু সবই সমন্বয়হীন। ফলে এর কোনো ক্রমবর্ধমান বা সামগ্রিক ফলাফল মুসলিম সম্প্রদায় পাচ্ছে না।

মুসলিম দেশের সরকার ও ইসলামি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে নতুন করে না ভাবলে অনৈক্যের এ সংকট অব্যাহত থাকবে, যা কোনোক্রমেই ইসলামি শিক্ষা আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে গতিশীল ও সফল করবে না।

টীকা

IES- Islamic Education Society.
IIUM- International Islamic University Malaysia.
IIUC- International Islamic University Chittagong.
IIIT- International Institute of Islamic Thought.
IERB- Islamic Economic Research Bureau.
BIU- Bangladesh Islamic University.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিজ্ঞানে মুসলমান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত'-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য তাকে জ্ঞান, বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। জ্ঞানের আকর বিজ্ঞানময় আল-কুরআনকে চূড়ান্ত হেদায়াতের উৎস হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও নবি, জ্ঞানী-শাসক, শিক্ষক ও ত্রাণকর্তা হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবুয়ত প্রদানের সংবাদস্বরূপ ওহি মারফত আল্লাহ যে ঘোষণা দেন তা হলো–

> 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত।' যিনি মানুষকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।' সূরা আলাক : ১-৫

মানবতার মহান শিক্ষক হজরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন–

> 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ।' ইবনে মাজাহ : ২২৪

একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে–

> 'জ্ঞান অর্জন করতে হলে সুদূর চীন দেশে যাও।'

বিখ্যাত তাফসিরকারক মালিক আকবর আলি কুরআনে জ্ঞান ও হিকমাহর (প্রযুক্তি) সহাবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান) পরস্পর সংযুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন—

'প্রজ্ঞা বিশ্বাসীদের হারানো সম্পদ। যেখানে সে তা পাবে, সেখান থেকেই সে তা কুড়িয়ে নেবে।' ইবনে মাজাহ : ৪১৬৯

আল-কুরআনে ৯২টি আয়াতে 'ইলম' এবং ৩০টি আয়াতে 'হিকমাহর' কথা এসেছে। সেইসঙ্গে ৩২টি আয়াতে জ্ঞানীদের দৃষ্টিসম্পন্ন এবং জ্ঞানহীনদের 'অন্ধ' বলা হয়েছে।

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম নিয়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পর্বে? নবুয়ত লাভ করে ২৩ বছরের অক্লান্ত সাধনায় হজরত মুহাম্মাদ ﷺ ইসলামকে একটি বিজয়ী জীবনবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। তিনি ও তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ ইসলামের একটি অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে জ্ঞানচর্চা, নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার ও মানবতার কল্যাণের জন্য সেসবের ব্যবহারের ওপর জোর দেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের যে অধ্যায়টি গির্জা ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের ফলে 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত, সেই যুগে ইসলামের বিজ্ঞানমনস্কতার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা ও প্রযুক্তির সৃষ্টিশীলতায় একটি 'রেনেসাঁসের' উদ্ভব ঘটে।

হিজরির প্রথম শতকে ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটে পশ্চিমে আফ্রিকার আটলান্টিক অববাহিকা থেকে পূর্বে চীনের গ্রেটওয়াল পর্যন্ত। আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি থেকে সাহারা পর্যন্ত। ইতোমধ্যেই তা আন্দালুসিয়া হয়ে পিরেনিজ পর্বতমালা, এমনকী পরিব্রাজকের বেশে ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্পূর্ণ জাজিরাতুল আরব, ইরান, আফগানিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব হয়ে কয়েক শতকের মাঝে তা গোবি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মধ্য এশিয়ায়।

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের সোনালি সময় হচ্ছে সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। যদিও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কিছু কিছু মুসলিম বিজ্ঞানীর অবদান নজরে পড়ে। আজ বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক অত্যাশ্চর্য উচ্চতায় এগিয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান চোখে পড়ছে না; বরং শিক্ষা-দীক্ষা ও বিজ্ঞানে তাদের পশ্চাদপদতা অন্যদের হাসির খোরাকে পরিণত করেছে। এ কথা সত্য, কিন্তু পৃথিবীকে আবার কল্যাণমাতায় ভরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র মুসলমানরাই রাখে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের যে বিপুল অবদান, তা ইতিহাস বিকৃতির পাল্লায় পড়ে সবাই ভুলে আছে; অথচ ওইসব অবদানই আজকের বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ প্রবন্ধে বিজ্ঞানে মুসলিম অবদানের একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে, যাতে আগামী প্রজন্ম এর বিস্তারিত জানার উৎসাহ লাভ করে। এসব উৎসাহী পাঠকদের মাঝ থেকে নতুন সময়ের ইমাম জাফর সাদিক, জাবির ইবনে হাইয়ান, আল বেরুনি, ইবনে সিনা, আর খাওয়ারিজমি, ওমর খৈয়াম প্রমুখ দিকপাল বিজ্ঞানীর জন্ম হবে।

বিজ্ঞানের মৌল উপাদানসমূহের আবিষ্কার

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ, সংস্কারক বিজ্ঞানী রজার বেকন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Opus Majus*-এ 'Scientiae Experimentalis' বা 'Experimental Science' অর্থাৎ 'পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানসমূহ' অনুজ্ঞাটি প্রথম ব্যবহার করেন। এটি নিঃসন্দেহে বিখ্যাত আরবি পরিভাষা Al-Ulum al Tajribiyan-এর অনুবাদ। তাঁর Scientiae ব্যবহৃত হয় Ulum-এর স্থলে এবং Experimentalis ব্যবহৃত হয় Tajribiyan-এর স্থলে। আধুনিক বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নীরিক্ষা বহির্ভূত কোনো কিছুকে গ্রহণ করা হয় না। অর্থাৎ পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানই আধুনিক বিজ্ঞান।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা, মহান জ্ঞানী হজরত আলি (রা.) রসায়ন সূত্রের প্রথম প্রণেতা হিসেবে বিবেচিত। তাঁর নাতি ইমাম জাফর সাদিক (৬৯৯-৭৬৫ খ্রি.) ছিলেন এ ক্ষেত্রে তাঁর সার্থক উত্তরাধিকারী। ইমাম জাফরের সাগরেদ জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২২-৭৭৭ খ্রি.) রসায়নের মায়াশাস্ত্রকে (Magic Art) কার্যকর বিজ্ঞানে রূপ দেন। জাবির তাঁর ছাত্রদের বলতেন, নিজ হাতে কোনো কিছুকে পরীক্ষাপূর্বক সত্য হিসেবে না পেলে তাকে সত্য বলে গ্রহণ না করতে। সম্ভবত এ জন্য তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তাজরিবা বা পরীক্ষা-গবেষণা পদ্ধতি চালু করেন।

প্রথাগত পদ্ধতিতে আল ফারাবি তাঁর *ইহসাউল উলুম*, ইখওয়ানুস সাফা তাঁর *রিসালাতুস সানায়িউল ইলমিয়াহ* এবং ইবনে সিনা তাঁর *রিসালাহ ফি আকসামিল উলুমিল আকলিয়া* গ্রন্থে বিজ্ঞানের কয়েকটি শ্রেণিকরণ করেন। ইখওয়ানুস সাফা ও আল ফারাবি বলেছেন, তিন শ্রেণির বিজ্ঞানের কথা। যেমন : অঙ্কশাস্ত্রীয় (Mathmatical), মানবরচিত বিধানসমূহ (Man made laws) এবং প্রকৃত দর্শন (Real Philosophical)। অপরদিকে ইবনে সিনা সাধারণ মানবিক জ্ঞানের আওতায় তাঁর সময়কার ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(Islamic Sciences) আনেননি। অপর একদল, যাদের মাঝে ইবনে নাদিম তাঁর বই ফিহরিস্ত (কোটালগ তালিকা)-এ তাঁর সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিজ্ঞানকে ১০ ভাগে ভাগ করেন।

ইবনে হাজাম দুই ভাগে ভাগ করেন। প্রথম ভাগ ছিল ইসলামি আইন (কুরআন, হাদিস, জুরিসপ্রুডেন্স, ব্যাকরণ, ভাষা ও ইতিহাস) এবং বিভিন্ন জাতির জন্য সাধারণ বিজ্ঞান (অঙ্ক, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, কবিত্ব, বাগ্মিতা ও ন্যায়শাস্ত্র)। দ্বিতীয় ভাগ ছিল রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি।

ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমায় বিজ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে ওই সমস্ত বিষয়, যা ব্যক্তি নিজের মন ও ক্ষমতা দ্বারা বুঝতে পারে। এতে চারটি অত্যাবশ্যকীয় বিজ্ঞান থাকে– বুদ্ধি ও দর্শনের বিজ্ঞান (যুক্তিবিদ্যা) প্রাকৃতিক জ্ঞান (চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষি, নভোবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি)। প্রত্যাদিষ্ট বিজ্ঞান এবং সংখ্যাবিজ্ঞান (সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও সংগীত)। দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে কুরআন ব্যাখ্যার পদ্ধতি, কুরআন পাঠ ইত্যাদি। তাসকুবরাহ জাহাদকে বলা হয় বিজ্ঞান শ্রেণিকরণে শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিত। তিনি বিজ্ঞানকে ৭ ভাগে ভাগ করেন।

ইসলামের প্রথমদিকের বিজ্ঞানীরা অনেকেই উপর্যুক্ত বিজ্ঞানের একাধিক শাস্ত্র নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান মূলত রসায়নশাস্ত্রের জনক বিবেচিত হলেও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, ভাষা, দর্শন, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, লজিক ও কবিতা বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেন। আবু আলি আল হোসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ; যিনি ইবনে সিনা নামে সমধিক পরিচিত, তিনি মূলত চিকিৎসাশাস্ত্রের বিজ্ঞানী হলেও বিজ্ঞানের অন্য শাখা নিয়েও কাজ করেছেন।

প্রফেসর সাকাও-এর মতে, আল বেরুনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। গণিত, জ্যোতির্শাস্ত্র, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, ন্যায়, সভ্যতার ইতিহাস, দিনপঞ্জির তালিকা ও ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক হস্তক্ষেপের নিদর্শন বর্তমান। প্রায় সব বিষয়েই তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, এসব মুসলিম বিজ্ঞানীরা যখন এত সব বিষয়ে দিকদর্শন দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। এমনকী কয়েকশত বছর পর বিজ্ঞানের পক্ষ নেওয়ায়, গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানীকেও চার্চের কাছে আনত মস্তক হয়ে বলতে হয়েছে, 'আমি আমার দাবির জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী এবং ঘোষণা করছি যে পৃথিবী ঘুরছে না।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা

বদর যুদ্ধে বিজয় ও ৭০ জন কাফির গ্রেফতারের পর নবিজি ঘোষণা করেন, 'যে মুশরিক ১০ জন মুসলিমকে পড়তে ও লিখতে শেখাবে, সে মুক্ত হতে পারবে।' এভাবেই শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়। পরবর্তী খলিফাগণও জ্ঞানচর্চার এ ধারা অব্যাহত রাখেন।

হিজরি ২১৫ সালে আব্বাসীয় খলিফা মামুন ২,০০,০০০ দিনার (প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার) ব্যয়ে বাগদাদে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলেন, যার নাম 'বায়তুল হিকমাহ'। এর সাথে ছিল একটি জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দির ও গণপাঠাগার। তিনি সেখানে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে তাদের বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, গণিত ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করেন, যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১০০ উটের বোঝা।

গুস্তাব লি বোঁ (Gustab Le Bou) তাঁর *ইসলাম ও আরবি সভ্যতার ইতিহাস* বইতে লিখেছেন–

> 'ইউরোপে যখন বই ও পাঠাগার ছিল না, সত্যিকার অর্থে তখন বাগদাদের বায়তুল হিকমায় ৪০ লাখ, কায়রোর সুলতানের পাঠাগারে ১০ লাখ, সিরিয়ার ত্রিপোলি পাঠাগারে ৩০ লাখ গ্রন্থ ছিল। অপরদিকে মুসলমানদের সময় কেবল স্পেনেই প্রতি বছর ৭০ থেকে ৮০ হাজার বই প্রকাশিত হতো।'

ড. অ্যান্না মেয়ারহোফ লিখেছেন–

> ইস্তাম্বুলের মসজিদগুলোর জন্য ৮০টি পাঠাগার ছিল। প্রতিটি লাইব্রেরিতে ১০ হাজার বই ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ছিল। নাসেহ, মসুল, বাগদাদ, ইরান ও ভারতের শহরসমূহেও অনুরূপ সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ছিল।'

ড. গুস্তাব তাঁর বইতে আরও অগ্রসর হয়ে বলেন–

> 'মুসলমানরা কোনো শহর অধিকারে নিলে প্রথমেই প্রতিষ্ঠা করত একটি মসজিদ ও একটি কলেজ। বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা ও অন্যান্য স্থানে পরীক্ষাগার, মানমন্দির, বিরাট পাঠাগার এবং জ্ঞান সাধনার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমৃদ্ধ বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কেবল আন্দালুসিয়ায় ছিল ৭০টি গণপাঠাগার। কর্ডোভার আল হাজাম পাঠাগারে ৬০ হাজার বই ছিল। অথচ এর চার শতাব্দী পরে চার্লস দি ফাস্ট বিবলিওথিক ন্যাশনাল অব প্যারিস শুরু করেন ৯০০ বই নিয়ে, যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল ধর্মের ওপর রচিত।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পণ্ডিত সেহেরু তাঁর *A Glimpse at World History*-তে লিখেছেন–

'কর্ডোভায় ১০ লাখেরও বেশি লোক বাস করত। সেখানে ১০ কি.মি দীর্ঘ পাবলিক পার্ক ছিল। ৪০ কি.মি জুড়ে তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৬০০০ প্রাসাদ ও বড়ো বড়ো বাড়িঘর ছিল। ২০০০০০ সুন্দর আবাস বাড়ি, দোকানপাট, ৩০০ মসজিদ, ৭০০ হাম্মামখানা (ঠান্ডা ও গরম পানির সরবরাহ) ছিল। অসংখ্য পাঠাগার ছিল, যার মাঝে রাজকীয় পাঠাগারে ৪০০০০০ বই ছিল। ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় বিখ্যাত ছিল কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি দরিদ্রদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।'

ড. মরিস বুকাইলি তাঁর গ্রন্থ *The Bible, The Quran and Science*-এ উল্লেখ করেন–

'অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। যখন খ্রিষ্টীয় জগতে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা চলছিল, তখন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহুসংখ্যক গবেষণা ও আবিষ্কার সাধিত হয়।'

কর্ডোভার রাজকীয় পাঠাগারে ৪০০০০০ বই ছিল। ইবনে রুশদ সেখানে গ্রিক, ভারতীয় ও পারস্য দেশীয় বিজ্ঞানে পাঠদান করতেন। যার কারণে সারা ইউরোপ থেকে পণ্ডিতরা কর্ডোভায় পড়তে আসত; যেমনটি আজকে শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য মানুষ আমেরিকা যায়। আমরা আরব সংস্কৃতির কাছে বহুলভাবে ঋণী– গণিত (বীজগণিত একটি আরবীয় আবিষ্কার), জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির জন্য। মধ্যযুগের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রথম বিজ্ঞানকে আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করে। এ সময় মানুষ অনেক বেশি ধর্মপ্রাণ ছিল, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রে মানুষকে একই সাথে বিশ্বাসী ও বিজ্ঞানী হতে বাধা দেয়নি; বরং বিজ্ঞান ছিল ধর্মের যমজ ভাই।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

Dr. Mayerhof তাঁর বই *The Legacy of Islam*-এ লিখেন–

'মুসলিম ডাক্তারগণ ক্রুসেড যুদ্ধে আগত মেডিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্টদের অগোছালো ও প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা দেখে হাসতেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইউরোপীয় সে সময়ে ইবনে সিনা, জাবির, হাসান বিন হাইসাম বা রাজির বইসমূহের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে ল্যাটিন ভাষায় তাদের বইগুলো অনূদিত হয়। এসব অনুবাদ এখনও বর্তমান, কিন্তু কোথাও অনুবাদকের নাম নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে ইবনে রুশদ (Averroes) ও ইবনে সিনার (Avicenna) বইসমূহ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে ইতালি ও ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠদানের মৌলিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।'

একই গ্রন্থের তিনি আরও লিখেন–

'আল রাজির মৃত্যুর পর ইবনে সিনা তাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। চিন্তা, দর্শন ও সাধারণ বিজ্ঞানে তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর অবদান (সমরকন্দের লাইব্রেরিতে গ্রীক গ্যালনের রচনাবলির আরবি অনুবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা) ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া অন্যান্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে আন্দালুসিয়ার আবুল কাসেম, ইবনে জাহর, ইরানের আব্বাস, মিশরের আলি ইবনে রেজভান, বাগদাদের ইবনে ইসাউ, মসুলের আম্মার, আন্দালুসিয়ার আবু রুশদ ছিলেন অন্যতম। এদের বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।'

মুসলমানগণ যখন স্পেন জয় করে, ইউরোপ তখন কলেরার ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে কিছুই জানত না। লোকেরা মনে করত, এ রোগটি হচ্ছে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি আসমানি আজাব। মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাই প্রথম প্রমাণ করলেন যে, কেবল কলেরা নয়; প্লেগও একটি সংক্রামক ব্যাধি।

বলা হয়ে থাকে– চিকিৎসাবিজ্ঞানের যখন অস্তিত্ব ছিল না, হিপোক্রিটিস তাকে অস্তিত্বে আনেন। যখন এ শাস্ত্রটি হ-য-ব-র-ল হয়ে যায়, আল রাজি তা পুনর্বিন্যাস করেন। এরপরও যখন তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, ইবনে সিনার মহান প্রয়াস তাকে সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে। Dr. Mayerhof এ বিষয়ে লিখেন–

'ইবনে সিনার বিখ্যাত গ্রন্থ "কানুন" *(The Canon)* চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাস্টারপিস হিসেবে এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, পঞ্চদশ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে এর ১৬টি সংস্করণ মুদ্রিত হয়; যার ১৫টি ল্যাটিন এবং ১টি আরবি।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিজ্ঞানের অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে ষোড়োশ শতাব্দীতে এর শত শত মুদ্রণ হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটিই ছিল সর্বাধিক পরিচিত চিকিৎসাগ্রন্থ। এখনও চিকিৎশাস্ত্রের অনেক বিষয়ে এ গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়। এয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছর এ বইটি ছিল ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার চিকিৎসাবিজ্ঞানে একমাত্র মূল টেক্সট।

উইল ডুরান্ট (Will Durant) লিখেন– মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজি মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মাঝে অগ্রসর ছিলেন। তিনি দুই শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা, যা ব্যাপকভাবে আজও পঠিত হয়। তাঁর বিশেষ অবদান হচ্ছে–

১. গুটিবসন্ত ও হাম *(Smallpox and Measles)* : এটি ১৮৪৭ থেকে ১৮৬৬ সালের মাঝে ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় ৪০ বার মুদ্রিত হয়।

২. মহান বিশ্বকোষ *(The Great Encyclopedia)* : এটি ২০ খণ্ডের বিশাল বিশ্বকোষ, যা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই বিশ্বকোষের ৫ খণ্ড ছিল চক্ষুবিজ্ঞানের ওপর। ১২৭৯ সালে এটির ল্যাটিন অনুবাদ হয় এবং কেবল ১৫৪২ সালে এর ৫টি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। শত বছর ধরে চোখ, চোখের রোগ ও তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থগুলো প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। ১৩৯৪ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তার চিকিৎসাবিজ্ঞান কোর্সের ৯টির ১টি হিসেবে এটিকে গ্রহণ করে।

মুসলিম ডাক্তারগণ সার্জারিতেও অনেকদূর এগিয়ে যান। তারা এনেসথেসিয়ার প্রয়োগও করতেন। যদিও ধারণা করা হয়, এটি সাম্প্রতিক সময়ের আবিষ্কার। আল রাজির অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে ছিল– জ্বরে ঠাণ্ডা পানির ব্যবহার, ক্ষত সারানোর ব্যাপারে পারদ ও পশুর ব্যবহার ইত্যাদি।

মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণই প্রথম আঙ্গুলের নখ দেখে যক্ষা রোগ নির্ণয়, জন্ডিস রোগের সুচিকিৎসা, ক্ষরণ বন্ধে ঠাণ্ডা পানির ব্যবহার, কিডনি ও ব্লাডারের পাথর সরানোর জন্য তা ভাঙা, হার্নিয়া রোগের শল্যচিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত ইসলামি শল্য চিকিৎসক ছিলেন আন্দালুসিয়ার আবুল কাসেম। তিনি বহুসংখ্যক শল্য-যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক ও এ বিষয়ের গ্রন্থকার। তাঁর এসব বই ১৮১৬ সাল পর্যন্ত ল্যাটিন ভাষায় ব্যাপক সংস্করণে মুদ্রিত হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওষুধশাস্ত্র (Pharmacy)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অন্যতম শাখায় মুসলমানদের অবদান অসামান্য। গুস্তাব লি বোঁ লিখেন–

> 'টাইফয়েড রোগের চিকিৎসার জন্য ঠান্ডা পানির ব্যবহার, যা ইউরোপ একবার মুসলমানদের কাছ থেকে গ্রহণ করে ফেলে দিয়েছিল! কয়েক শতাব্দী পর তারা আবার তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। এ ছাড়াও মুসলমানদের অনেক উদ্ভাবনের কাছে তারা ঋণী। মুসলমানরাই প্রথম রাসায়নিক ওষুধসমূহকে পিল ও মিশ্রর হিসেবে ব্যবহার শুরু করে, যা বর্তমানেও অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। এসবের অনেকগুলোকেই বর্তমান সময়ের রসায়নবিদগণ নতুন আবিষ্কার বলে চালিয়ে নিতে চান। এর কারণ অবশ্য ইতিহাস সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা। মুসলমানদের ডিসপেন্সারিগুলোতে রোগীরা চিকিৎসাপত্র নিয়ে গেলে পর্যাপ্ত ওষুধ পেত। যেখানে কোনো হাসপাতাল সুবিধা ছিল না, সেখানে ডাক্তারগণ তাদের যন্ত্রপাতিসহ রোগীর সেবায় ছুটে যেতেন।'

জর্জি জাইদান (Georgi Zeidan) লিখেন–

> 'ইউরোপের আধুনিক ওষুধবিজ্ঞানীগণ তাদের পেশার ইতিহাস ঘাটতে গিয়ে দেখেছেন– শতবর্ষ আগে মুসলিম ডাক্তারগণ আধুনিক ও কার্যকর উপায়-উপাদান ব্যবহার করেছেন। তারা একটি ফার্মাকোলজি (ওষুধশাস্ত্র) গড়ে তোলেন, জটিল রোগের চিকিৎসা করতে সমর্থ হন এবং সেখানে আধুনিক মডেলের ফার্মেসি গড়ে তোলেন।'

কেবল বাগদাদ শহরের ৬০টি ঔষধালয় থেকে খলিফার খরচে বিনা পয়সায় ওষুধ দেওয়া হতো। ইউরোপেও অনেক ওষুধের নামে আরবি, ভারতীয় ও ফারসি প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন– এলকোহল, এলকালি, এলকানের, এপ্রিকেট, আর্সেনিক ইত্যাদি।

হাসপাতাল

জর্জি জাইদান বর্ণনা করেন,

> 'রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর দুইশত বছর পরে, মক্কা-মদিনাসহ সকল বড়ো বড়ো মুসলিম শহরে হাসপাতাল গড়ে ওঠে। আব্বাসীয় গভর্নরগণ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের নিজ নিজ এলাকায় শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। কেবল বাগদাদেই ছিল ৪টি বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল। তৃতীয় হিজরিতেই গভর্নর আব্দুল্লাহ দেইলামি আদুদি হাসপাতাল গড়ে তোলেন, যেখানে ২৪ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন। তৎকালীন সময়ে এটি-ই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতাল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার চেয়ে ভালো হাসপাতাল তৈরি হয়। এসব হাসপাতালে রোগীরা ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে সমান যত্ন ও সেবা লাভ করত। বিভিন্ন রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ড ছিল। এসব হাসপাতালে ছাত্ররা তত্ত্বের পাশাপাশি রোগী পর্যবেক্ষণ করত। তা ছাড়া কতিপয় ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল ছিল, যেসবের ডাক্তার ও যন্ত্রপাতি বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যাওয়া হতো। সেলজুকি সুলতান মাহমুদ-এর সাথে এমন এক ভ্রাম্যমান হাসপাতাল ছিল, যা বহন করে নিতে ৪০টি উট লাগত।'

ড. ওস্ত্রাব লি বো লিখেন–

'মুসলিম হাসপাতালসমূহে প্রতিষেধক ওষুধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার এমন উন্নত ব্যবস্থা ছিল যে, সেখানে মৃতদের ছাড়া সবারই রোগ আরোগ্য হতো। সেখানে আলো-বাতাসের প্রাচুর্য ও প্রবাহমান পানির সুব্যবস্থা থাকত। সুলতান মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল রাজিকে বাগদাদের উপকণ্ঠে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থান খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলে তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যাকটেরিয়ামুক্ত স্থান বাছাই করেন। এসব হাসপাতালে বড়ো সাধারণ ওয়ার্ড এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য প্রাইভেট ওয়ার্ডের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্ররা এখানে রোগ নির্ণয়, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করত। এ ছাড়া ছিল বিশেষ ধরনের মানসিক হাসপাতাল এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের জন্য ঔষধালয়।'

মার্ক ক্যাপ (Mark Kapp) লিখেছেন–

'কায়রোতে একটি বড়ো হাসপাতাল ছিল, যেখানে জীবন্ত ঝরনা, বিশাল ফুলের বাগান, ৪০টিরও বেশি উঠোন ছিল। সেখানে রোগীদের সাদরে গ্রহণ করা হতো, সুস্থ হয়ে গেলে ৫টি স্বর্ণমুদ্রাসহ তাকে ঘরে ফেরত পাঠানো হতো। সে সময় কর্ডোভা নগরীতে ৬০০ মসজিদ, ৯০০ গণশৌচাগার (হাম্মাম)। এসবের পাশাপাশি ৫০টি হাসপাতালও ছিল।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমানরা যখন এসব সুউচ্চে ও প্রসারিত হাম্মামখানায় সাবান এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে প্রবাহমান পানিতে গোসল করত, আমেরিকা তখনও জঙ্গল আর গুহা থেকে বেরোয়নি। শিখেওনি কীভাবে গোসল করতে হয়। ইউরোপ তখন সভ্যতা, সংস্কৃতির জন্য অক্সফোর্ড ছেড়ে কর্ডোভার দিকে ছুটছিল।

রসায়নশাস্ত্র

ইমাম জাফর সাদিকের শিষ্য জাবির ইবনে হাইয়ান 'রসায়নশাস্ত্রের জনক' হিসেবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আরব রসায়নশাস্ত্রের জনক। পশ্চিমা রসায়নশাস্ত্র ও আলকেমির ওপর তাঁর প্রভাব ছিল ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী। তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত এবং এখনও টিকে আছে। সাবেক ইরাকি শিক্ষামন্ত্রী মরহুম সৈয়দ হেবাতউদ্দিন শাহরিস্তানি লিখেন–

> 'আমি জাবিরের ৫০টিরও বেশি গবেষণাপত্র দেখতে পাই, যা তাঁর শিক্ষক ইমাম জাফরকে উৎসর্গ করা। তাঁর ৫০০টি গবেষণাকর্ম মুদ্রিত অবস্থায় প্যারিস ও বার্লিনের জাতীয় পাঠাগারে পাওয়া যায়। ইউরোপের জ্ঞানীরা তাকে আদর করে "বুদ্ধিমত্তার অধ্যাপক" (Wisdom Professor) বলে ডাকে। সেইসঙ্গে তারা স্বীকার করে যে, তিনি ১৯টি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারক। জাবির বলেন, "যেকোনো বস্তুকে আলো ও আগুনের সাহায্যে এমন অণুতে পরিণত করা সম্ভব, যা বস্তুর অদৃশ্যমান ক্ষুদ্রতম ইউনিট।"
>
> জাবির-এর এই তত্ত্বটি আধুনিক পারমাণবিক বিজ্ঞানের অতি নিকটবর্তী। নাদিম রচিত *ফিহরিস্ত* ও অন্যান্য তালিকায় জাবির রচিত রসায়ন গ্রন্থের পরিমাণ ২৭৭টি, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৭০। তাঁর গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা দুই থেকে ১০০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুই বা তেড় পৃষ্ঠার এসব বই এক-একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। তাঁর চিকিৎসাসংক্রান্ত বই ৫০০টি, জ্যোতির্বিজ্ঞানসংক্রান্ত একটি, দার্শনিক যুক্তি-খণ্ডনের বই ৫০০টি।'

জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নের শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করেন। তিনি হাতে-কলমে পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর জোর দেন। *কিতাবুত তাজ, কিতাবুল মাওয়াজিন, কিতাবুর রাহমাহ মাগির, কিতাবুল খাওয়াস, কিতাবুল হুদুদে* তিনি এই বিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রসায়নশাস্ত্রের যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা চালাতে হয়, তিনি সেসব বর্ণনা করেন। নিজের আবিষ্কৃত পরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের সাথে মিলিয়ে এসবের উন্নয়ন করেন। তিনি পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, পরিস্রাবণ, দ্রবণ, কেলাসন, ভস্মীকরণ, গলান, বাষ্পীভবন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর ওপর বিশদ লেখালেখি করেন। এসব প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণনা ছিল বৈজ্ঞানিকভাবে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত।

জাবির টিন, সিসা, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি তৈরির পন্থা আবিষ্কার করেন। তাঁর ব্যবহারিক ও ফলিত রসায়নের মাঝে ইস্পাত তৈরি করার পন্থা, কাপড় ও চামড়া রং করার প্রণালি, লোহা ও পানি নিরোধক কাপড়ে বার্নিস করার উপায়, কাঁচ তৈরি করার জন্য ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড-এর ব্যবহার, সোনার জলে নাম লেখার জন্য লৌহের ব্যবহার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বস্তুর রং করা, খনিজ দ্রব্য ও ধাতব পদার্থের উৎপাদন, ইস্পাত প্রস্তুতি, ট্যানিং ইত্যাদি কারখানার কৌশল মুসলমানরাই প্রথম আবিষ্কার করে। তারাই নাইট্রিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, নাইট্রো গ্লিসারিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, পটাশিয়াম, এক্বুয়া নাইট্রেট, এলকোহল, এলকালি অরপিমেন্ট, অরপিসেন্ট ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। বেরাক্সও তাদের আবিষ্কার। আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে পাতন, বাষ্পীকরণ, পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া এবং সোডিয়াম, কার্বন, পটাসিয়াম কার্বোনেট, ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়ার ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

পদার্থ বিজ্ঞান

ইবনে আল হাইসাম (আল হাজেন, ৯৬৫-১০৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে উন্নত পর্যায়ের পরীক্ষামূলক অবদান রাখেন। প্রফেসর আব্দুস সালামের মতে– 'তিনিই প্রথম বলেন, আলোকরশ্মি কোনো মাধ্যমে অতিক্রম করার সময় সহজ ও দ্রুততর পথ বেছে নেয়।' এভাবে তিনি বহু শতাব্দী আগেই ফারমেটস-এর সর্বনিম্ন সময় তত্ত্বের (Principle of Least Time) অনুরূপ তত্ত্ব প্রদান করেন।

তিনি সর্বপ্রথম জড়তা তত্ত্ব (Law of Inertia) প্রদান করেন, যা পরবর্তী সময়ে Newton-এর 'ল অব মোশন' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তিনিই প্রথম আলোর প্রতিসরণের তত্ত্ব প্রদান করেন, যা পরবর্তী সময়ে নিউটনের হাতে পুনরাবিষ্কৃত ও বিস্তৃতি লাভ করে। পদ্ধিমা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সমসাময়িক আল বেরুনির সহযোগিতায় তিনি বিজ্ঞান,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায় পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কার্যত ইউরোপে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত পথিকৃৎ রজার বেকন-এর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি Opus Majus-এর পঞ্চম অধ্যায় বাস্তবিক অর্থে ইবনে আল হাইসামের গ্রন্থ অপটিক্স (Optics) এর নকল মাত্র। যদিও পশ্চিমা বিশ্ব তা স্বীকার করে না।

আল বেরুনি (৯৭৩-১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে) ভারত ও আফগানিস্তানে অনেক কাজ করেন। গ্যালিলিওর বহু পূর্বেই তিনি প্রকৃতির আইন (Inveriance of Law of Nature) আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, পদার্থবিদ্যার যে বিধান পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল, তা আকাশ ও গ্রহপথসমূহেও ক্রিয়াশীল। মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানী আবুল হাসান সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। গ্যালিলিও তাঁর উন্নত সংস্করণ তৈরি করেন মাত্র। অথচ বর্তমান বিশ্ব জানে গ্যালিলিওই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক। ইবনুল হাইসাম তাঁর গ্রন্থ মাকালাতুল ফি মারাকাজুল আসকাল গ্রন্থে বস্তুর পরস্পরের আকর্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি ও দার্শনিক মাওলানা রুমি, কবিতায় মধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ধারণা দেন। সম্ভবত সেই পথ ধরে পরবর্তী স্যার আইজাক নিউটন এ বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব দাঁড় করান।

শিল্প কারখানা

আব্বাসীয় খলিফা হারুন-উর-রশিদ এইক্সের শার্লেমানের কাছে বাগদাদ থেকে উপঢৌকন হিসেবে একটি ঘড়ি পাঠান, যা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেজে উঠত। এটি দেখে সদ্য সিংহাসনে আসীন রোমান শাসক ও তাঁর সভাসদগণ চমৎকৃত ও আনন্দিত হন।

আন্দালুসিয়ায় খ্রিস্টানদের ধ্বংসলীলার ফলে মুসলিম শাসকদের সময়কার বড়ো বড়ো কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলা, কৃষি ও সভ্যতার অন্যান্য উপাদানে স্থবিরতা নেমে আসে। দক্ষ রাজমিস্ত্রির অভাবে শহরের অবকাঠামো নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। মাদ্রিদের জনসংখ্যা ৪ লাখ থেকে ২ লাখে নেমে আসে। যে সেভাইলে ১৬০০ শিল্প-কারখানা ছিল, সেখানে ৩০০ কারখানা টিকে। সেখানে ১৩০০০০ শ্রমিক চাকরি হারায়, অথচ জনসংখ্যা তখন প্রায় ৭৫% কমে গেছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমানরাই প্রথম প্রাচীন চর্ম-কাগজের পরিবর্তে তুলার তৈরি কাগজের প্রচলন করে এবং এর মাধ্যমেই ইউরোপে মুদ্রণশিল্পের বিকাশ হয়। অবশ্য মুদ্রণ পদ্ধতি আসে প্রাচীন চীন থেকে। এ থেকেই বই-পুস্তক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের রেনেসাঁসের সূচনা হয়। কাগজ আবিষ্কারের ফলেই প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর পুনর্লেখন সম্ভব হয়।

ফিলিপ হিট্টি (Philop Hitti) তাঁর *History of the Arabs* গ্রন্থে লিখেন–

> 'সড়ক তৈরির প্রযুক্তি মুসলমানদের হাতে এতটা উন্নত হয় যে, কর্ডোভায় মাইলের পর মাইল পাকা সড়ক ছিল। রাস্তার দুপাশে রাতে বাতি জ্বলত; যাতে লোকেরা নিরাপদে পথ চলতে পারে।'

অথচ, সে একই সময়ে লন্ডন বা প্যারিসের পথে বৃষ্টিস্নাত রাতে বের হলে হাঁটু পর্যন্ত জলমগ্ন ও কর্দমাক্ত হতে হতো। এ অবস্থা কর্ডোভায় পাকা রাস্তা আসার সাতশত বছর পরও ছিল। অক্সফোর্ডের লোকেরা তখন মনে করত, গোসল করা একটা অপকর্ম; যখন কর্ডোভার ছাত্ররা বিলাসবহুল হাম্মামখানা ব্যবহার করত।

গণিতশাস্ত্র

আধুনিক বিজ্ঞানে অঙ্ককে বলা হয় 'মা'। কমপিউটার-এর আবিষ্কার এবং এর উন্নতি কেবলই অঙ্কনির্ভর। *Legacy of Islam* গ্রন্থের 'Astronomy and Mathematics' অধ্যায়ে Barron Carra de Vaus বলেন–

> 'অ্যালজেব্রা হচ্ছে আরবি আল-জবর কথাটির ল্যাটিন রূপ।'

আল-জবর অর্থ শক্তি, ভাগ্য বা অসংগতি। এটিকে এককথায় সংক্ষিপ্তকরণ বলা যায়। এটি বর্ণের পরিবর্তে সংখ্যা বা সংখ্যার পরিবর্তে বর্ণের ব্যবহার। কুরআনে ব্যবহৃত হরফে 'মুকাত্তায়াত'-এর মতো এটির প্রয়োগ। গণিতের ভাষায় এটি ভগ্নাংশকে পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করা, জটিল সংখ্যাকে সহজতর ভাষা বা সংকেতে উপস্থাপন করা। বিজ্ঞান আজ যেসব সংখ্যা ব্যবহার করছে, তা আরবি সংখ্যা। বর্তমানে ব্যবহৃত কমপিউটার প্রযুক্তির মূল ভিত্তি হচ্ছে হিন্দু প্রতীক থেকে '০' বা শূন্যের যে মূল্যমান আরবরা গ্রহণ করেছে তা। '০' বা Zero-এর নিকটতম শব্দ Chiper, যা কিনা আরবি Ka Serf-এর প্রতিলিপিকরণ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

De Vaux আরও লিখেন, Clipper ব্যবহার করে আরবরা নিত্য ব্যবহার্য গণিতের পথপ্রদর্শক হন। তারা বীজগণিতকে একটি প্রকৃত বিজ্ঞানে রূপ দেন এবং উন্নয়ন ঘটান। তারাই বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির ভিত্তি রচনা করেন। তারাই ত্রিকোণমিতির একমাত্র স্থপতি। এলগারিদম কথাটি আসে এর আবিষ্কারক খিভ-এর বাসিন্দা আল খারেজমির নাম থেকে। আরবরা বিজ্ঞানের যখন উৎকর্ষতার চরম পর্যায়ে, ইউরোপ তখন চরম বর্বরতায় নিমজ্জিত। আল খারেজমি প্রথম আল জবর ওয়াল মোকাবিলা পদ্ধতির ব্যবহার করতে থাকেন। বস্তুর সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ ও কঠিন বস্তুর এবস্ট্রাক্ট ফরমুলেশানের নিয়ম (হান্দ বা তাহদিল) তিনি প্রণয়ন করেন।

খারেজমি মনে করতেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল শক্তি হচ্ছে গণিত। সূত্র ও বিশ্বের গণনার জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত প্রক্ষেপণ নীতি The Formula of Interpolation-কে নিউটনের আবিষ্কার বলে চালালেও তাঁর জন্মের বহু পূর্বে আল বেরুনি শুধু এর আবিষ্কারই করেননি; তিনি এর ব্যবহার করে সাইন (Sine) তালিকা প্রণয়ন করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পৃথিবীর আকার, পরিধি ইত্যাদি বিষয়ে যে আলোচনার অবতারণা করা হয়, তাতে সর্বশেষ অবদান রাখেন মুসলিম বিজ্ঞানী বনি মুসা ভ্রাতৃদ্বয় ও আল বেরুনি। আল বেরুনির *কানুনে মাসউদি*-এর ৪র্থ খণ্ডে প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। তিনি দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, দিক নির্ণয়, গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থানজ্ঞাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করার সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় নির্ধারণ করেন। জ্যোতির্বিদগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক আল বাত্তানিও একজন মুসলিম। স্থানাঙ্কের যেকোনো ২টি বিষয়ে জানতে পারলে অন্যগুলো নির্ধারণের যে সহজ ফর্মুলা আল বেরুনি দিয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

আল রায়হান বেরুনি তাঁর *কিতাবুত তাফহিম লি সানয়াতি তানজিম* গ্রন্থে লিখেছেন-

> 'যে ব্যক্তি ৪টি বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেনি, তাকে জ্যোতিষী বলা যেতে পারে না। এ ৪টি বিজ্ঞান হলো- অঙ্কশাস্ত্র (Mathematics), গণিত (Arithmetic), বিশ্বগঠনতন্ত্র (Cosmography) এবং বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষী (Judicial Astrology)। আল বেরুনি ছিলেন সর্ববিচারে একজন সার্থক জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী।'

নভোমণ্ডলী, নভোবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থানের অবস্থান, শহর-নগরের আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ গণনা সম্পর্কীয় গ্রন্থ, আলোর গতি সম্পর্কীয় গ্রন্থ,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যন্ত্রোপাতি সহযন্ত্রাদি এবং লেন্সের ব্যবহার সম্পর্কিত গ্রন্থ, কাল ও সময় সম্পর্কিত গ্রন্থ, উদ্যান ও কৃত্তিকাবিষয়ক গ্রন্থ, জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ সহ নানা নামে তাঁর ৭৯টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রয়েছে।

অনেকে যাকে কেবল রুবাইয়াতের কবি হিসেবে চিনি, সেই ওমর খৈয়াম ছিলেন একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত। নিউটনের বহু আগে তিনি আবিষ্কার করেন 'বাইনোমিয়াল থিওরাম'। এ পদ্ধতিতে তিনি সূর্যের চারদিকের পৃথিবীর সময়মান ঠিক করে জালালি ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করেন।

ভূগোল

প্রথম কয়েক শতাব্দীর মাঝেই আরবের মুসলিমরা ইসলামের সুমহান বাণী ছড়িয়ে দেন মরক্কো থেকে মিন্দানাও পর্যন্ত। আরব্য রজনীর সিন্দাবাদকে দেখি চীন, জাপান আর ইন্দোনেশিয়ান দারুচিনি দ্বীপের দেশে ঘুরতে। এতে বোঝা যায়, আরবরা আগে থেকেই ভূগোল, ভূবিদ্যা ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাশাপাশি আরব নাবিকরা আফ্রিকার পূর্ব তীর থেকে রাশিয়ার দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকা পৌঁছায়। ভারতে আসার সমুদ্রপথও প্রথম আবিষ্কার করে। জ্যোতির্বিদ্যা, জাহাজ পরিচালনা বিজ্ঞান, মহাসাগরের বৈজ্ঞানিক বর্ণনাকারী এবং সাগরের প্রাণী সম্পর্কে বহু গ্রন্থের প্রণেতা মুসলিম বিজ্ঞানী 'আহমদ বিন মজিদ'।

বিখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ ইবনে হুকাল (৯৭৫ খ্রি.) তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন–

> 'আমি এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা ও অক্ষাংশ সম্বন্ধে লিখেছি। এর সকল দেশ, সকল সীমানা এবং ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে লিখেছি। আমি এসবের মানচিত্র এঁকেছি সযত্ন প্রয়াসে। সেখানকার শহরসমূহ, নদী ও হ্রদসমূহ, ফসলাদি, কৃষির ধরন, রাস্তাঘাট, এক স্থান হতে অন্য স্থানের দূরত্ব, বাণিজ্যিক দ্রব্যসমূহ এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়, যা রাজন্যবর্গ ও তাদের সহযোগীসহ সাধারণ মানুষের কাজে লাগতে পারে– এমন সবকিছু নির্দেশ করেছি। সম্ভবত এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ মানচিত্র।'

মুসলিম পরিব্রাজক আবু রায়হান আল বেরুনি, ইবনে বতুতা ও আবুল হোসাইন ওইসব লোকদের মাঝে অনন্য, যারা ভূবিদ্যার ইতিহাস রচনার জন্য কষ্টকর অভিযাত্রা আর অসাধারণ পর্যবেক্ষণসংক্রান্ত তথ্যাদি রেখে গেছেন। বিজ্ঞানের দিগ্‌দিক অভিযাত্রায় তাদের অবদানকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হায় সোনালি অতীত

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা যেকোনো মুসলিম তরুণের হৃদয়ে একটি নতুন ভাবনার জন্ম দেবে। কী সুন্দর, গৌরবময় ও ঐতিহ্যশালী আমাদের অতীত। পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাসে কী স্বর্ণোজ্জ্বল আমাদের অবদান! কিন্তু এ যে কেবলই অতীত। বিগত কয়েকশত বছর পর্যন্ত বিজ্ঞানে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান আমাদের নেই। আমরা কি কেবলই অতীতের স্মৃতিচারণ করে জীবন কাটাব? না, কক্ষনোই নয়।

আজ প্রতিটি মুসলিম তরুণকে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া মুসলিম ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেলতে হবে। পাশ্চাত্য ওরিয়েন্টালিস্ট পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে আমাদের ইতিহাস ও পণ্ডিতবর্গের নামে যে বিপুল বিকৃতি ঘটেছে, তার হাত থেকে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করতে হবে। আর তা ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র। আফসোস আর হতাশার কৃষ্ণপর্বতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর কোনো অবকাশ আমাদের নেই। এখন সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার। নতুন যুগের আল বেরুনি, খাওয়ারেজমি, জাবির ইবনে হাইয়ানদের এগিয়ে আসার দিন।

উঠুন, জেগে উঠুন, অন্তত গজার বেকনের মতো জেগে উঠুন। অক্সফোর্ডের ছাত্র হওয়ার বেকন কর্ডোভায় গিয়ে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার সংস্পর্শে থেকে সব উপকরণ বগলদাবা করে যদি নব্য ইউরোপের রেনেসাঁসের জন্ম দিতে পারেন, বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলমানদের মাঝে কি এমন একজনও নেই, যে আবার ফিরিয়ে আনবে আমাদের সোনালি অতীত?

গ্রন্থ নির্দেশনা

১. Western Civilisation through Muslim Eyes; Sayid Mujtaba Rukni Musawi lary, 1978 Iran.
২. Origin and Development of Experimental Science; Dr. Muin-Ud-Din Ahmad Khan, BIIT, 1998.
৩. Classification of Sciences in Islamic Thought; AJISS, Vol-13, Number 1, Washington DC, 1996 (প্রবন্ধ)
৪. আল বেরুনি; এম আকবর আলী, ই. ফা. বাং, প্রকাশনা, ১৯৮২
৫. জাবির ইবনে হাইয়ান; এম আকবর আলী, ই. ফা, বাং, প্রকাশনা, ১৯৮২

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামে নারী : বিভ্রান্তি ও বাস্তবতা

আমরা বিশ্ব ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ হলেও মানবতা ব্যাপক বিপর্যস্ততার মুখোমুখি। দেহ-মন-আত্মার সমন্বয়ে জ্ঞান-বিবেক-ইচ্ছার স্বাধীনতার বিশেষত্বসহ যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, তারা আজ অস্থিরতার শিকার, নিজের তৈরি যন্ত্রণায় কাতর। বিশেষ করে শরিয়তের বিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে বিশ্বসমাজ নানা বৈশ্বিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এর অন্যতম হলো, মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধি এবং কল্যাণের উৎস নারীকে ক্রমান্বয়ে ভোগ-বিলাসের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

কবি যদিও বলেছেন–

'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

বাস্তবে নারী এ স্বীকৃতির পেছনে হন্য হয়ে ছুটছে, তবুও প্রকৃত মর্যাদা, স্বীকৃতি ও সম্মান তার ভাগ্যে জুটছে না। বর্তমান সভ্য জগতের এক বিরাট অংশ নারীকে কন্যা-জায়া-জননীর আসন থেকে সরিয়ে এনে, পুরুষের সমকক্ষ করে উপস্থাপনের যে লড়াইয়ে নেমেছে, সে লড়াইয়ে পাশ্চাত্যের 'নারী' হয়েছে ক্লান্ত-শ্রান্ত, বিপর্যস্ত ও দিকভ্রান্ত। আর প্রাচ্যের 'নারী' অন্ধের মতো ছুটছে তার পশ্চাৎ অনুসরণের দিকে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সভ্যতার হাজার বছরের ইতিহাসে নারীর অধিকার কোথায়, কতটুকু ছিল, বর্তমানে তা কী অবস্থা অতিক্রম করছে এবং ইসলাম নারীকে কী মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছে, তা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। তবে বর্তমান প্রবন্ধে শুধু নারীর অধিকার সুরক্ষায় ইসলাম কী কী ব্যবস্থা করেছে এবং সেগুলো নিয়ে বিরাজমান বিভ্রান্তিগুলোর জবাব উপাস্থাপন করা হচ্ছে।

এর আগে আমাদের ইতিহাসে ফিরতে হবে।

মানবাধিকারের ইতিহাস

এটি সকলেই বিশ্বাস করেন যে, মানব ইতিহাসে নবি-রাসূল ও ধর্ম প্রবর্তকগণ প্রথম মানুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে এসব অধিকার নিয়ে যত পর্যালোচনাই হোক না কেন, ধর্মীয়-সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশ ধরেই সবাইকে এগোতে হয়েছে।

হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রাজ-রাজাদের একটি ভূমিকা ছিল। রাজাগণ প্রজাহিতৈষী মনোভাব নিয়ে যত না বিধান রচনা করেছেন, তার চেয়ে বেশি করেছেন শাসনের প্রয়োজনে। বলা হয়– খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বছর আগে বাবুলের শাসক 'হাম্মুরাবি' কিংবা বাবুল বিজয়ী ইরানি শাসক 'সাইরাস' খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেন, যা ইনফ্রি ও অসভ্য জাতিকে দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করে। ইতিহাসে গ্রিক, রোমান শাসকদের হাতে আইন রচনার ঘটনাও পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো মানুষের অধিকার রক্ষায় খুব অল্পই ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

ইউরোপ ও তার দোসরদের হাজারো চেষ্টার পরও ইতিহাসের এ সত্যকে অস্বীকার করার জো নেই যে, ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধকার যুগ সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে। ইসলামের পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে বিপর্যস্ত মানবতা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সর্ববাদী সম্মত একটি বিধান লাভ করে, যা মানব অধিকারের কোনো দিক ও বিভাগকে আওতার বাইরে রাখেনি।

দীর্ঘ সাধনার পর বিগত শতাব্দীতে মানবজাতির আন্তর্জাতিক ফোরাম 'জাতিসংঘ' ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের সাধারণ অধিবেশনে "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ" অনুমোদন করে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেখানে ইউরোপ জুড়ে পূর্ববর্তী কয়েকশত বছর ধরে মানবতা, মানবাধিকার প্রকটভাবে বিপর্যস্ত ও অস্বীকৃত ছিল, সেখানে মুসলিম সমাজ-সভ্যতার চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম কেবল একটি বিধিবিধান হিসেবেই নয়; সর্বব্যাপ্ত বিজয়ী বিধান হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে এসব বিধান কেবল কতিপয় সুসমাচার ছিল না; ছিল প্রযোজ্য ও বিস্তারিত আইন।

যা হোক, জাতিসংঘ ঘোষিত সনদের ভূমিকা বা অন্য কোথাও ১৫০০ বছর আগে ইসলাম যে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, ভাষা-সংস্কৃতি, ধনী-নির্ধন সবার স্বার্থ রক্ষা করে একটি মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিল, অজ্ঞাত কারণে সে সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। এই নীরবতার পেছনে একটি কারণ ছিল– 'ইসলাম' বিষয়ে একটি পটভূমি তৈরি করে রাখা। অথচ এ সনদের অধিকাংশই ইসলাম প্রবর্তিত মানবাধিকারের বিধানসমূহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

মুসলিম রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহের কাছে বিগত কয়েক দশক ধরে ইসলামের মানবাধিকার আইনসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব আসে। প্রগতিশীল ও সহজসাধ্য বিষয় হিসেবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে রাষ্ট্রীয় সরকারসমূহ ইজতিহাদের শাশ্বত বিধান অনুযায়ী অনেক দেশেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনেছে।

অবশেষে নানা পদ্ধতি, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৯০ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে আশির দশকে করা হওয়া একটি মানবাধিকার দলিল চূড়ান্ত করা হয়। ওআইসির ফিকহ কমিটি ইসলামি চিন্তাবিদ, আইনজ্ঞ ও ফকিহদের সাথে নিয়ে দশ বছর সাধনা করে এ কাজটি করেন। এটির ইংরেজি শিরোনাম– 'OIC Declaration of Human Rights in Islam.' কায়রো ঘোষণা নামে এটি সর্বাধিক পরিচিত।

'ইসলামে নারী' বিতর্কের হেতু

যেকোনো বিষয়ে ইসলামি আইনের উৎস সাধারণত কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। এগুলো ইসলামের মূল। এ বিষয়ে অজ্ঞতা নিয়ে কোনো বিষয়ে ইসলামি ধারণা লাভ করা দুরূহ এবং তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশেও যদি কাউকে 'ইসলামে নারীর অবস্থান' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে। যেমন–

- একদল বলবেন– ইসলাম নারীকে প্রয়োজনীয় ও সর্বোচ্চ মর্যাদা, অধিকার দিয়েছে। তাদের মাঝে একটি অংশ জেনে-বুঝে-বিশ্বাসের সাথে বলবেন, আবার একটি বিরাট অংশ অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের কারণে বলবেন। কিন্তু প্রশ্নের মুখে এর পক্ষে যুক্তি দিতে ব্যর্থ হবেন।
- অপর একটি দল বলবেন– ধর্ম হিসেবে ইসলাম ঠিক আছে। ১৪০০ বছর আগে জীবনের এত জটিলতা ছিল না, তাই ধর্মীয় বিধান দিয়ে চলা যেত। এখনকার প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীর সব বিষয় সঠিকভাবে সমাধা করতে পারে না। এরা মূলত প্রচারণা ও স্রোতের বুকে গা ভাসিয়ে দেওয়ার দল। তাদের নিজস্ব মতামত খুবই কম।
- অপর একটি দল ইসলামকে অন্য ধর্মের সমার্থক মনে করে সম্পূর্ণ নেতিবাচক কথা বলবেন। ইসলাম নারীকে মানুষ মনে করে না। নানা বিষয়ে ঠকায়, বন্দি করে রাখে, স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে দেয় না– ইত্যাকার নানান কথা।

এরা অধিকাংশ নাস্তিক। কেউ কেউ প্রকাশ্যে আস্তিক, কিন্তু বিশ্বাস ও কর্মে নাস্তিক্যের ধারক ও বাহক। ধর্মদ্রোহ তাদের একমাত্র পণ্য, যা বিক্রি করে তারা বিশ্ববাজারে টিকে আছেন।

এর বেশ কিছু কারণ আছে। যার কয়েকটি নিম্নরূপ–

৭ম শতাব্দী হতে যতদিন মুসলমানগণ শক্তি-শৌর্য-বীর্য ও সভ্যিকারের চেতনা নিয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছেন, ততদিন নারীর মর্যাদা, সম্মান ও অধিকারের কোনো অবমাননা হয়নি; বরং তা ছিল সুরক্ষিত। অতঃপর পতনযুগে মুসলিম শাসকগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামের মূল উৎস থেকে সরে আসেন। তারপরও বড়ো ধরনের সমস্যা তৈরি হয়নি।

সমস্যার শুরু তখন, মুসলিমরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা ত্যাগ করে বিজিত ও শাসিত উপনিবেশে পরিণত হয়। পর্যায়ক্রমে তারা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপারেও অজ্ঞতার শিকার হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ মুসলিম দেশগুলোতে রোমান ও ইউরোপীয় আইন প্রতিষ্ঠিত করে। ইউরোপ ইতোমধ্যে ধর্ম, মানবতা ও মানবাধিকারের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ করে ওইসব ধর্মীয় আইনে, যেখানে নারীর কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ছিল না। ফলে ধরে নেওয়া হয়েছে ইসলামও এর থেকে আলাদা কিছু নয়। অন্য ধর্মের মতো ইসলামও বুঝি নারীকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত করে রেখেছে।

ঔপনিবেশিক আমলে (১৮৩৫ সালে ভারতে, '৩৭ সালে মিশরে) প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে মুসলিম তরুণ-তরুণীরা ইসলাম সম্পর্কে মিশ্র ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। একদল বেড়ে উঠে ধর্মীয় বিষয়ে অগ্রহী হয়ে, অন্যদল বেড়ে উঠে বেপরোয়া ধর্মহীন হয়ে। এর ফলে সুচতুর পশ্চিমা বিশ্ব তাদের প্রাচ্যতত্ত্বকে মুসলিম বিশ্ব ও অন্যদের কাছে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

এটা সুকৌশলে ওদের জানিয়ে দেয় যে জ্ঞান, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মানবতা ও কল্যাণ বলতে যা বোঝায়, তা 'পশ্চিম' থেকে এসেছে। পূর্ব থেকে উত্থিত 'ইসলাম' একটি সেকেলে ধর্মীয় বিধান। আধুনিক মানুষের উপযোগী কোনো বিধান সেখানে নেই। 'নারী' সেখানে অন্তঃপুর বাসিনী, সমাজের এক বোঝা। নারীর সমস্ত অধিকার সেখানে রহিত, মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত, পুরুষের হাতে তারা বন্দি।

নারীর বিষয়ে অন্য ধর্ম ও সভ্যতা

ইসলামপূর্ব ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর কোনো স্বীকৃতি ছিল না।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নারী ছিল হীনতা, অপরিচ্ছন্নতা, অস্পৃশ্যতা ও পাপের প্রতীক। সেখানে বিরাজমান ধর্মীয় বিকৃতির পথ ধরে নারী কোনো অধিকারই পেত না। অল্প কথায় নারীকে মনে করা হতো : একটি পরজীবী সৃষ্টি, সকল প্রকার স্বর্গীয় কল্যাণ কেবল পুরুষের জন্য।

নারীর সৃষ্টি পুরুষের জন্য; পুরুষ নারীর জন্য নয়। এ দুয়ের কোনো তুলনা হতে পারে না। নারী নীচ ও অপবিত্র। পুরুষ মহৎ সৃষ্টি, কিন্তু নারী সে মর্যাদা ভোগ করে না। নারী স্বর্গচ্যুত, পাপের জীবাণু এবং অপবিত্রতা বিস্তারকারিনী। নারী কখনো বেহেশতে যেতে পারে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুর্ভাগ্যজনকভাবে নারীর ব্যাপারে এসব অন্যায় ও অসত্য দৃষ্টিভঙ্গি কেবল পাশ্চাত্যেই বিরাজমান নয়; বরং বিশ্বের অন্য ধর্ম ও সভ্যতায়ও তা সমভাবে উপস্থিত। কেবল 'ইসলাম' এর ব্যতিক্রম।

সভ্যতা, সংস্কৃতি ধর্ম রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ফিরে তাকালে এর ভুরিভুরি প্রমাণ মিলবে। চীন, ভারত, ইরান, গ্রিক ও রোমান সভ্যতার বিগত কয়েক শতাব্দীর পর্যালোচনা করলে নিচের চিত্রটি পাওয়া যায়।

চীন : সেখানে নারী ছিল নীচ সামাজিক অবস্থানে। চীনের রাজপরিবারের এক ভাগ্যাহতা নারী এ বিষয়ে বলেন–

> 'আমরা নারীরা সমাজের নিম্নতম স্থানে অবস্থান করি এবং সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত কাজগুলোই আমাদের জন্য বরাদ্দ।'

চীনা প্রবাদে ছিল, 'নারীর চেয়ে নীচ ও সস্তা আর কিছুই হতে পারে না।' স্বামীর উপস্থিতিতে আহার গ্রহণের অধিকারও চীনা নারীর ছিল না। আর কন্যাদের ছিল না সম্পদের কোনো উত্তরাধিকার।

ভারত : সেখানে নারীরা ছিল দাসী, বন্দি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। স্বামীকে তাদের প্রভু ও দেবতা হিসেবেই ডাকতে হতো, এমনকী এখনও হয়। স্বামীর নাম মুখে আনার কোনো অধিকার তার ছিল না। 'মনু'র মতে– নারী অপরিচ্ছন্নতা এবং মিথ্যার প্রতীক।

ইরান : প্রাচীন পারস্যে নারীর কোনো সামাজিক ও আর্থিক স্বাধীনতা ছিল না। পারসিক ও সামানিদের সময়ে তার অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রাচীন ইরানে সমসাময়িক অন্য সভ্যতার তুলনায় নারীর কিছু ভালো অবস্থা থাকলেও প্রিয়তমা স্ত্রী ছাড়া অন্যদের অবস্থান ছিল বাঁদি, দাসী ও শ্রমিক হিসেবে। তাদের মর্যাদা সামগ্রিকভাবে শ্রমদাসীর চেয়ে বেশি ছিল না। যেখানে নারী ছিল পছন্দ-অপছন্দ ও মনের স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

গ্রিক : প্রাচীন গ্রিকে নারীর কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তার কোনো আলাদা সত্তাই স্বীকার করা হতো না। সভ্যতার সেই সোনালি যুগে নারীর না ছিল কোনো অবস্থান আর না ছিল তার কোনো ভূমিকা। নারী ছিল হয় অবরোধবাসিনী কিংবা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মাধ্যম অথবা সে বাধ্য ছিল গণিকাবৃত্তির নিমিত্তে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিখ্যাত গ্রিক বা গিশ ডেমস্টন (Demoston)-এর ভাষায়– 'ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমাদের চাই রমণী, আর বৈধ সন্তানের জন্য চাই স্ত্রী।'

গ্রিসে নারী বেচা-কেনা হতো। এমনকী উপঢৌকন হিসেবেও তাকে ব্যবহার করা হতো। ডেমস্টন-এর মাকে তার বাবার বন্ধু উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। কথিত আছে, সক্রেটিস তাঁর স্ত্রীকে অপর এক বন্ধুর জন্য ধার দিয়েছিলেন, যার নাম ছিল এলসি বাইটেড (Alsy Butad)। প্রাচীন গ্রিসের প্রথা ছিল– স্বামী তরুণ না হলে স্ত্রীকে তরুণ শয্যাসঙ্গী গ্রহণ করতে হতো। যাহোক, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কারও সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে নারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো।

রোম : রোমে দাসদের মতো বেচা-কেনা হতো নারী। স্বামী বা পিতার জীবিতাবস্থায় নারীর সম্পত্তি, সংঘ বা বাঁচার অধিকার ছিল না। স্বামী ও পিতা তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের বিক্রি করতে, ধার দিতে কিংবা ভাড়ায় খাটাতে পারত। এমনকী তারা তাদের হত্যাও করতে পারত।

পশ্চিমা সমাজ ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের চোখে যেসব সভ্যতার উজ্জ্বল্য এখনও ঝলমল করছে, ওপরের বর্ণনাটি তাদের সামনে নারীর অধিকারের একটি সামান্য আলোকচ্ছটা। পশ্চিমা সভ্যতা ও তাদের আইনের আদি উৎস এসব সভ্যতা।

অপরদিকে, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের চোখে নারীর মর্যাদা ওইসব জাতির চেয়ে ভালো কিছু ছিল না। ইহুদিদের একটি অংশের মতে– বাবা অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা সন্তানদের বিক্রি করতে পারতেন।

কোনো কোনো খ্রিষ্টান পাদ্রির দৃষ্টিতে নারী শয়তানের প্রতিনিধি বা সাক্ষাৎ দূত। নারী সকল পাপ ও ধর্মদ্রোহের মূল। দীর্ঘদিন তারা গবেষণা চালিয়েছে– নারী কি ইবাদাত করতে পারবে? পুরুষের মতো সেও কি বেহেশতে যেতে পারবে? তারা এও আলোচনা করেছে, নারী কি আদৌ মানব বংশজাত? তার কি আদৌ আত্মা আছে? নাকি সে এক প্রেতাত্মা?

নারীর প্রতি এই বিশেষ ঘৃণা এবং গুরুত্বহীনতার কথা বিবেচনা করে খ্রিষ্টান পুরুষদের মাঝে যৌনাঙ্গকে ছেদন করতে উৎসাহিত করা হতো। মনে করা হতো, বিয়ে পুরুষকে নরকগামী করার একটি প্রক্রিয়া।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামপূর্ব যুগের আরব : এখানেও অন্য জাতির মতোই অবস্থা বিরাজমান ছিল। বাস্তবে যাযাবরী এক বেদুইন জাতির কাছে এর বেশি কিই-বা আশা করা যায়, যেন হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সভ্যতার ধারকদের অবস্থা ছিল এত নাজুক। আরবের অসভ্য জাতি নারীকে দাসীর দৃষ্টিতে দেখত। কন্যাসন্তানের জন্মকে দেখত ঘৃণার চোখে। কারণ, সে লড়াই করতে পারত না। পারত না কোনো কঠিন কাজ কিংবা আত্মরক্ষা করতে। কন্যা সন্তানের জন্মসংবাদ তাদের চেহারাকে রাগে লাল করে ফেলত। কোনো কোনো গোত্র তো জন্মের সাথে সাথেই কিংবা সুযোগ পাওয়া মাত্রই কন্যা সন্তানকে হত্যা কিংবা জীবিত কবর দিত। কোনো কোনো গোত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর নারী (তার স্ত্রী) হতো ছেলের অধিকারে চলে যেত।

আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত, জাহেলি যুগে চার প্রকার বিয়ে চালু ছিল।

এক. যা বর্তমানে প্রচলিত। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেবে এবং পাত্রীকে মোহর দিয়ে বিয়ে করবে।

দুই. কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ঋতু থেকে পবিত্র হলে বলত, তুমি অমুকের কাছে চলে যাও এবং তার সঙ্গে মিলিত হও। তারপর সে ব্যক্তি তার স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকত। অন্য ব্যক্তি দ্বারা গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকত না। এমনকী তাকে স্পর্শও করত না। নিজের স্ত্রীকে অন্যের দ্বারা গর্ভবতী করাতো, যাতে সে চমৎকার একটি সন্তান লাভ করে। এমন বিয়েকে বলা হতো– ইস্তিবদা।

তিন. দশজনের মতো ব্যক্তি একই সঙ্গে এক মহিলাকে বিয়ে করত এবং সকলেই তার সঙ্গে মিলিত হতো। তারপর মহিলা গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসবের কয়েকদিন পর সে সকলকে ডেকে পাঠাত। সকলেই আসতে বাধ্য হতো। সকলে তার সামনে উপস্থিত হলে সে বলত, 'তোমাদের সকলেরই নিজেদের কৃতকর্মের কথা জানা আছে। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি।' তারপর সে মহিলা তাদের মধ্যে থেকে পছন্দমতো কাউকে সম্বোধন করে বলত, 'হে অমুক! এটি তোমারই সন্তান।' ফলে সন্তানটি সেই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হতো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চার. বহু পুরুষ একসঙ্গে হয়ে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে মিলিত হতো। যারাই সেই মহিলার কাছে আসত, সে কাউকেই বাধা দিত না। এরা ছিল পতিতা। এরা প্রতীক হিসেবে নিজেদের ঘরের ওপর পতাকা লাগিয়ে রাখত। যে কেউ অবাধে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারত। এমন মহিলারা সন্তান প্রসব করলে তার সঙ্গে যারা মিলিত হয়েছিল, তাদের ডেকে আনা হতো। একজন বংশবিশারদও সেখানে থাকত। সে যার সাথে শিশুসন্তানের সাদৃশ্য পেত তাকে বলত, 'এটা তোমার সন্তান।' পরে লোকেরা সন্তানটিকে তার সাথে সম্পর্কিত করত। সেও তা স্বীকার করত।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন নবি ﷺ-কে সত্য দীনসহ প্রেরণ করলেন, তখন তিনি জাহিলি যুগের প্রচলিত সব বিয়ে বাতিল করে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি বহাল করলেন। বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য

আল কুরআনে এসব বিষয়ে আলোচনা এসেছে এবং তার বিরোধিতা করা হয়েছে।

পর্যালোচনা করলে ইসলামের আগমনের আগে আমরা বিশ্বে নারী জাতির মর্যাদার তিনটি বিবর্তনের যুগ পাই–

প্রথম পর্যায়ে : নারীকে বিবেচনা করা হতো গৃহস্থালি বস্তু হিসেবে, যা ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য এবং ভাড়ায় ও ধারে ব্যবহারযোগ্য। নারী ছিল পুরুষের কাজ ও সেবার মাধ্যম, যা দিয়ে সন্তান উৎপাদন, সম্পদের সুরক্ষা ও প্রজন্ম জারি রাখা হতো। নারী ছিল ভারবাহী পশু। স্বামীর নিকট সম্পদের অধিকার তো দূরের কথা, তার সাথে একত্রে খাবার অধিকারও ছিল না। স্বামী তাকে হত্যা করতে এবং ইচ্ছামতো নির্যাতন করতে পারত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে : প্রত্যাদিষ্ট ধর্মসমূহের আবির্ভাবের সাথে এর যাত্রা। এখানে নারীকে পণ্য থেকে বের করে এনে পুরুষের মতো মানুষ মনে করা হলো। কিন্তু সামাজিকভাবে পুরুষ-নারী সম্পর্কটি থেকে গেল প্রভু-দাসী সম্পর্কে। নারীকে পুরুষ বেচতে, কিনতে, ধার দিতে এবং উপঢৌকন হিসেবে দিতে পারত। তাকে পুরুষের জন্য কাজ করতে হতো। তার জাগতিক যৌন চাহিদা মেটাতে হতো। তার কোনো ইচ্ছার স্বাধীনতা ছিল না। সম্পদের উত্তরাধিকারবঞ্চিত নারীর ছিল না কোনো আর্থিক স্বচ্ছলতা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বেচ্ছায় সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের অধিকার ছিল না। স্বামী বা পিতার মৃত্যুর পর নারীর যাবতীয় সম্পদের উত্তরাধিকার হতো মৃতের সন্তানরা।

এই তো, ৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দেও ফ্রান্সের ধর্মীয় সম্মেলনে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নারীও মনুষ্য বংশজাত, তবে তার সৃষ্টি পুরুষের সেবার জন্য। আজ থেকে ১২০ বছর আগেও সুইজারল্যান্ডে নারীকে মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হতো না।

তৃতীয় পর্যায়ে : ইসলামের আগমন ঘটে। নারী এই প্রথম জানল যে, জন্ম থেকেই সে পুরুষের মতোই সমমর্যাদার মানুষ। তার বাঁচার, উন্নয়নের সামাজিক ও ব্যাপক উন্নতির অধিকার আছে। আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদাতের অধিকার একই রকম। সমাজ ও পরিবারে তার একটি সম্মানজনক অবস্থান সুনিশ্চিত। তারও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এখতিয়ার এবং সুযোগ সমান। সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের স্বাধীনতা রয়েছে। তারও পুরুষের মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে। পুরুষ ও তার মাঝে ইসলাম কেবল ততটুকু পার্থক্য নির্ধারণ করে, যা তার প্রকৃতির বিশেষত্ব এবং কর্ম ও দায়িত্বের বিভাজনের কারণে সংগত।

অপরদিকে, পশ্চিমা বিশ্বে নারীর মর্যাদাবিষয়ক বিবর্তন বর্তমান পর্যায়সহ ৫টি পর্যায় অতিক্রম করছে।

প্রথম পর্যায় : বর্বরতা ও অর্ধসভ্য যাযাবর সম্প্রদায়ের মতোই ছিল এ পর্যায়টি। নারীরা এখানে দুর্বল শারিরীক কাঠামো, প্রশিক্ষণের অভাব, জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবের কারণে পণ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হতো। তাদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না।

দ্বিতীয় পর্যায় : এ পর্যায়ে নারীকে মানুষ মনে করা হতো, তবে পুরুষের সমান নয়। পুরুষের সেবার জন্য নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হতো। সে পুরুষের মালিকানাধীন ছিল, এমনকী তার জীবন-মৃত্যুও ছিল পুরুষের নিয়ন্ত্রণে। এ অবস্থাকে বলা চলে সামন্ত ও জমিদারি প্রথার অনুরূপ। সামন্ততন্ত্রের ব্যর্থতার সাথে সাথে এ অবস্থারও কিছু পরিবর্তন হয়।

তৃতীয় পর্যায় : এ পর্যায়ে নারী একটি বিপ্লবী যুগে পদার্পণ করে এবং পুরুষ ও পরিবারের শৃঙ্খল থেকে আপাত ও তুলনীয় স্বাধীনতা লাভ করে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রচলিত আভিজাত্য, সামন্ত-সংস্কৃতি এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রটোকল, প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদির বিষয়ে নারীগোষ্ঠী স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ পেতে থাকে। তাকে তখন থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যে দেখা যেতে গেল। বাহ্যিক ও দাবিকৃত স্বাধীনতার সুবাতাস নারীর সুন্দর মুখটিকে আড়াল থেকে বের করে আনল।

এ অধ্যায়ের সূচনা ফ্রান্সের রেনেসাঁস ও বিপ্লবের পর থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমের শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ সময়টিতে পুঁজিবাদসহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি বিকশিত হতে থাকে। এ সময়ে নারীর মুখ স্বাধীনতা ও মুক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়। শৃঙ্খলের নোংরা বাধামুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে হাট-বাজারে ও কারখানায় পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে। সে নিজেই নিজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খুঁজে নিল। কন্যারা বাবার বাড়ি ছেড়ে গিয়ে তুলতে লাগল ক্ষুদ্রতম পরিবারসমূহ। নারী-পুরুষের সম্পর্ক হয়ে উঠল উদারনৈতিক। পূর্ণতা ও কঠোরতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কৃত্রিম আকর্ষণ, সাজ-সজ্জা, রূপচর্চা, ড্রেস ফ্যাশন আর অবসর নারীকে গ্রাস করল। প্রাচীনকালে পারিবারিক ভিত্তিকে পূত-পবিত্র মনে করা হতো, তা উবে গিয়ে এর মূল নড়বড়ে হয়ে পড়ল। যৌন স্বাধীনতার তোড়ে হারিয়ে গেল পরিবার। নৈতিকতার মহৎ অনুভূতি, স্নেহের আকর্ষণের স্থান দখল করল লালসা ও আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপ্রেম।

অভিজাততন্ত্র ও সামন্তবাদের সময় নারী যে যৎসামান্য মর্যাদা পেত, তাও এই পর্যায়ে হারিয়ে গেল। এই সময়কে বাস্তব ও গভীর নিরিখে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়– নারী পরিণত হয়েছে একটি বিলাসের সামগ্রীতে, যা কেনা-বেচা, ধার দেওয়া-নেওয়া এবং ভাড়া দেওয়া-নেওয়া যায়। তফাতটা হলো, মানবাধিকারের মুখরোচক স্লোগান ও প্রোপাগান্ডার এক রঙিন রংধনু তার গলায় শোভা পেল এবং সে এক বাহ্য জীবনে আবৃত হলো।

এ সময়ে সামন্তবাদ, অভিজাততন্ত্রের স্থলে গড়ে উঠতে লাগল স্বাধীনতা ও মুক্তির নতুন এক কাঠামো। জাত কৌশল ফ্রিম্যাসনবাদীদের হাতে তৈরি হতে লাগল এক বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি। স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি সব শ্রুতিমধুর মানবাধিকারধর্মী কথা-বার্তার আড়ালে বেড়ে উঠল বাধাহীনতার সংস্কৃতি, সেখানে যৌন দুর্নীতি ও নৈরাজ্য সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। এর সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হলো নারী, অথচ অবচেতনভাবে এই নারীই হলো এর প্রথম বলি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ স্বাধীনতার নামে নারী যতটুকু পেল, হারাল তার চেয়ে বেশি। কিছু চমৎকার আইন রচিত হলো ঠিকই, কিন্তু নারী কিছু পেশা ও বৃত্তিগত উৎকর্ষ ছাড়া নারীত্বকেন্দ্রিক সবকিছু থেকে পিছিয়ে পড়ল। এমনকী শুরু হলো অন্য বিতর্ক– নারী পুরুষ নয়; মানুষ হওয়ার স্বীকৃতি। সেখান থেকে লিঙ্গমুক্ত ভাষা! নারী এখন পুরুষও নয় নারীও নয়; বরং তৃতীয় লিঙ্গ বা Third Gender।

চতুর্থ পর্যায় : বর্তমানে নারী সেখানে এসে ঠেকেছে। নারী এখন কথার ফুলঝুড়ির আড়ালে প্রকৃত স্বাধীনতাবঞ্চিত এক দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা অতিক্রম করছে। আধুনিকতা ও মুক্তির শতবর্ষের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত। সত্যিকার অর্থে আজ আবার তার প্রকৃতির দিকে ফিরে আসার দিন। আর তার সূচনা পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকেই শুরু হয়েছে।

পঞ্চম পর্যায় : এটি হতাশাক্লিষ্ট মানবতা ও পশ্চিমের মানুষের ভবিষ্যৎ মুক্তির পর্যায়, যা মানবতার মুক্তির সনদ। ইসলামের সঠিক গ্রহণযোগ্য উপস্থাপনার মাধ্যমে অর্জন সম্ভব।

ইসলামে নারী

কলেবর না বাড়ানোর জন্য আমরা কেবল ইসলামে নারীর অবস্থানসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করলাম।

খ্রিষ্টজগৎ যখন মনে করত নারী এক ভিন্ন জগতের অনাসৃষ্টি, পুরুষনির্ভর পরজীবী সত্তা, পুরুষের বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি, ইসলাম তখন বলল– নারী ও পুরুষের সৃষ্টি ও ভাগ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তারা একটি এককে সত্তা থেকে সৃষ্ট।

কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

> 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করতে থাকো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তাঁর থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীকে। আর এ দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী।' সূরা নিসা : ১

এখানে 'মানুষ' শব্দটি দিয়ে নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধন করে স্রষ্টা সকল ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদায় সিক্ত করলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৯০ সালে কায়রোর ঘোষণায়ও এ বিষয়টি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে–

ধারা : ১

ক. আদম থেকে উদ্ভূত এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারের সদস্য। জাতি, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বিশ্বাস, রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক অবস্থান বা অন্য যেকোনো বিবেচনা নির্বিশেষে মূল মানবিক মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক থেকে সকল মানুষ সমান। খাঁটি ঈমান ব্যক্তির মধ্যে মানবিক পূর্ণতা এনে এ মর্যাদা বৃদ্ধির গ্যারান্টি দেয়।

খ. প্রতিটি মানুষ আল্লাহর (স্রষ্টার) অধীন। সেসব ব্যক্তিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, যারা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিয়োজিত এবং শুধু খোদাভীতি ও সৎকর্মের ভিত্তিতেই একজন মানুষ অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

আবার অনুচ্ছেদ ৬-তে সুস্পষ্ট করে বলা আছে–

১. মর্যাদা এবং তা ভোগ করার অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের দিক থেকেও নারী-পুরুষ সমান। নারীর রয়েছে স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা বা পরিচয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং তার নিজের নাম ও বংশ পরিচয় বজায় রাখার অধিকার।

২. পূর্বেকার ধর্মগুলোর মতো আদি পাপের জন্য নারীকে দায়ী না করে ইসলাম পরিষ্কার জানিয়ে দিলো–

> 'শয়তান সেখান থেকে তাদের দুজনকেই পদস্খলিত করল এবং তারা যে অবস্থানে ছিলেন, সেখান থেকে বের করে ছাড়ল।'
> সূরা বাকারা : ৩৬

তওবার ব্যাপারেও কুরআন বলল–

> 'তারা উভয়ে বললেন : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের ওপর অবিচার করে বসেছি। এখন আপনি যদি আমাদের ক্ষমা ও দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'
> সূরা আরাফ : ২৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. ইসলাম পরিষ্কার জানিয়েছে, পুরুষের মতো নারীও সৎ কর্মশীল হলে জান্নাতে যেতে পারবে এবং তার ধর্মপালন ও ইবাদাতের পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে। নারীর মর্যাদা প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> 'মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও বিনয়াবনত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী– আল্লাহ এদের সকলের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।' সূরা আহজাব : ৩৫

৪. ইসলাম নারীকে অপয়া, অবুঝ মনে করে না এবং কন্যা সন্তানের সংবাদে মুখ মলিন করা থেকে বিরত থাকতে বলে। সূরা নাহলের ৪৯ আয়াতে এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

৫. ইসলাম কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলার প্রথা নিষিদ্ধ করে এর বিরুদ্ধে ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করে। আল্লাহ বলেন–

> 'স্মরণ করো সে সময়টি, যখন মাটিতে প্রোথিত মেয়ে শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে– কী কারণে তাকে হত্যা করা হলো।' সূরা তাকভির : ৯

৬. ইসলাম নারীকে মা, মেয়ে ও স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা ও সম্মান করতে নির্দেশ দিয়েছে। তিন পরিচয়ে এখানে নারীর আলাদা আলাদা মর্যাদা ও অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আর রুমের ২১ আয়াতে, সূরা আল আহকাফের ১৫ আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতে এবং রাসূল ﷺ-এর হাদিসে আমরা এর বিশদ বিবরণ পাই।

ড. মুসতাফা আস সিবায়ি তাঁর গ্রন্থ *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*তে নারীকে প্রদত্ত ১২টি অধিকার ও মর্যাদা আলোচনা করার পর বলেছেন –

> 'ইসলাম জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদা দান করেছে, যা তার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেই তিনটি ক্ষেত্র হলো–

১. **মানবিক ক্ষেত্র :** এ ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও তার মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দান করেছে। অথচ অতীতের অধিকাংশ সভ্য জাতি হয় এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, নয়তো এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২. **সামাজিক ক্ষেত্র :** ইসলাম নারীর সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান নির্ধারণ করেছে। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তার বয়স যত বাড়ে, সম্মানও তত বাড়তে থাকে। শিশু থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রী থেকে মা-তে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে, বিশেষ করে বার্ধক্যে তার জন্য বাড়তি প্রীতি, ভালোবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩. **আইনগত ক্ষেত্র :** প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম নারীকে তার সকল কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছে। পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের কোনো কর্তৃত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়নি।

ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলাম নারীকে যেসব অধিকার প্রদান করেছে, সেগুলোকে আমরা প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথমত, সাধারণ অধিকারসমূহ; যা কিনা কোনো পার্থক্য ছাড়াই একজন নারী পুরুষের মতোই মানুষ হিসেবে নারী ভোগ করে থাকেন। অপরটি তাঁর বিশেষ অধিকার, যা নারী তাঁর বিশেষত্বের জন্য সুবিধা হিসেবে পেয়ে থাকেন। যেটা পুরুষের চেয়ে বাড়তি ও আলাদা।

সাধারণ অধিকারসমূহ

ইসলাম ১৪০০ বছর আগেই নারীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকারসমূহ প্রদান করেছে, যা পূর্বেকার ঐতিহ্য, প্রথা ও সমাজে কেবল পুরুষের জন্য নির্ধারিত ছিল। এভাবেই ইসলাম সমতা ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি অধিকারমালা নারীর জন্য নিশ্চিত করেছে। প্রথমেই আমরা সেসব অধিকার তুলে ধরছি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে : আগে যেখানে নারী নিজেই ছিল একটি 'সম্পত্তি', সেখানে ইসলাম তাকে সম্পত্তির অধিকার প্রদান করেছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করে পুরুষের গলগ্রহ ও অনুগ্রহ-অনুকম্পা থেকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম নারীকে সম্পদের মালিকানা, দখল ও ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করে ঠিক একজন পুরুষের মতোই। কুরআন বলছে–

> 'পুরুষের জন্য রয়েছে তার অর্জিত সম্পদের অংশ, আর নারীর জন্য রয়েছে তার অর্জিত সম্পদের অংশ।' সূরা নিসা : ৩২

অর্থাৎ নারী যে সম্পদ আয় বা অর্জন করবেন, তা কেবল তার। এখানে স্বামী, পিতা বা অন্য কোনো পুরুষ তার মালিক বা অংশীদার হতে পরবে না। হজরত খাদিজা ﵂-এর যত সম্পদ ছিল, তার মালিক তিনিই ছিলেন এবং বিয়ের পর তাঁর ইচ্ছাতেই রাসূল ﷺ সেগুলো ইসলামের জন্য ব্যয় করেন।

পশ্চিমা বিশ্ব হাজার বছরের বঞ্চনার পর বিগত শতাব্দীতে নারীকে যে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে, আমরা দেখেছি– সেখানেও প্রকারান্তরে নারীকে বাধ্যতামূলক সস্তা শ্রমে নিয়োগ করেছে। অপরদিকে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে তাকে পুরুষদ্রোহীতায় নামিয়ে দেয়, যার অনিবার্য ফল– পারিবারিক বিপর্যয়। আর ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সংসারের স্থিতিশীলতার একটি বাহনে পরিণত করে।

ইসলাম নারীকে প্রদান করেছে উত্তরাধিকারের অধিকার। এটিও নারীর সম্পদের অধিকারের একটি অংশ। ইসলামের আগমনের পূর্বে সমাজ ও সভ্যতায় নারীরা উত্তরাধিকার থেকে একেবারেই বঞ্চিত ছিল। ইউরোপের দেশসমূহে ক্রুসেডের সময়ও কন্যা সন্তানরা কোনো উত্তরাধিকারের অধিকার পেত না।

কুরআন বলছে–

> 'পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষদের অংশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদেও নারীদের অংশ আছে। সে সম্পদ কম হোক বা বেশি, তা হবে সুনির্ধারিত।' সূরা নিসা : ৭

এভাবেই ইসলাম পুরুষের মতোই নারীকে উত্তরাধিকারের অধিকার দিয়ে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে, একজন ছেলে দুজন মেয়ের সমান 'মিরাস' (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ) পাবে। এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে : যেহেতু রাজনৈতিক অধিকার একজন ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য অধিকারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, সেহেতু তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকারের বলেই একজন নারী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সমাজকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। নারী যখন মা– তখন সে সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে, যখন একজন স্ত্রী– তখন স্বামীর উত্তম দেখাশোনা ও পরামর্শের মাধ্যমে, যখন বোন– তখন পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং পরিবারে সবাইকে সাপোর্ট দেওয়ার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ ছাড়াও সমাজব্যবস্থার ভুলগুলো শুধরে দিয়ে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভোটাধিকার : ১৪০০ বছর আগে যখন অধিকাংশ সমাজ ও সভ্যতা নারীকে 'মানুষ' মনে করত না, তখনই ইসলাম নারীকে তাঁর মতামত জানানোর, পছন্দ ব্যক্ত করার এবং 'বাইয়াত' গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। আর বর্তমান রাষ্ট্রও তাকে প্রচলিত ভোটাধিকার প্রদান করেছে।

জুমার নামাজ এবং সমাবেশে অংশগ্রহণ : রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাবেশে অংশগ্রহণের অধিকার, ইসলামে নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির একটি উদাহরণ। ইসলাম নারীকে বৈধ সকল প্রকার সমাবেশ; যা তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনের অন্তরায় হবে না, তাতে অংশ গ্রহণের, বক্তব্য রাখার ও পাঠদানের অধিকার দিয়েছে। রাসূল ﷺ-এর যুগে মুসলিম নারীগণ জামায়াতে শরিক হতেন, তবে তারা পুরুষদের থেকে আলাদা পেছনের সারিতে দাঁড়াতেন।[২]

---

২. আবু দাউদ, মুসনদে আহমাদসহ অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থগুলোতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, নবি ﷺ বলেছেন– তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদ অভিমুখী হতে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্য তাদের ঘরই উত্তম। চোদ্দোশো বছর আগে উম্মাহর সোনালি যুগে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকাবস্থায়ই নবি ﷺ নারীদের জন্য তাদের ঘরকেই উত্তম বলেছেন, তাহলে চোদ্দোশো বছর পরের কথা তো বলাই বাহুল্য। আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ ফেতনার আশঙ্কায় নারীদের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়ার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। একই সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধে ও প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ : যুদ্ধ মূলত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আর্থ-সামাজিক বিধি ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিরক্ষার একটি ধরন। ইসলামে নারীর প্রকৃতি, শক্তি-সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখে সব ধরনের প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে— হোক তা দেশ, বিশ্বাস বা ব্যক্তিত্বের হেফাজতের জন্য। ইসলামের ইতিহাসে নারীদের যুদ্ধে রসদ সরবরাহ, আহতদের সেবা-শুশ্রূষা, ঘরবাড়ি পাহারা দেওয়াসহ উপযুক্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

পরিবার গড়ার অধিকার : স্বামী পছন্দ করার ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে মানব ইতিহাসে ইসলামই প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। এ অধিকারটি নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তারও স্বীকৃতি। বিয়ে করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বাধীন মতামত প্রদান, পারিবারিক জীবনকে সুন্দরভাবে বজায় রাখা, এসব সমাজের ওপর বড়ো ধরনের প্রভাব রাখে। ইসলামে নারী যদি কোনো 'বর'-কে তার জন্য উপযুক্ত মনে না করে, তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করতে পারে। এ বিষয়ে কেউ নারীর স্বাধীন মতামতের ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে পারে না। নারীর ক্ষেত্রে, তার স্বার্থের কথা চিন্তা করে পিতার মতামতকে শর্ত করা হয়েছে। পিতা যদি বুঝতে পারেন মেয়েটি সরলতার জন্য কোনো পুরুষ কর্তৃক প্রতারিত হতে যাচ্ছে কিংবা সম্পদ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে, তাহলে তিনি 'ভেটো' দেওয়ার অধিকার রাখেন।

বিয়ের কাবিননামা বা চুক্তিতে নারীর অনুমোদন তো লাগেই, গ্রহণ করাও (ইজাব) তার ওপর নির্ভরশীল। নারীর পক্ষ থেকে সেখানে প্রস্তাবটি যায় এবং পুরুষ 'কবুল' করার অধিকারী। এটি নারীর অধিকার ও ক্ষমতার (Authority) বড়ো ধরনের প্রমাণ।

ইসলামপূর্ব যুগে (এখনও কোনো কোনো উপজাতীয়দের মাঝে, এমনকী গ্রামীণ সমাজে চালু আছে) দুই লোক কথা দিয়ে ফেলল যে, তাদের ছেলেমেয়ের মাঝে বিয়ে হবে। এটাই পরবর্তী সময়ে ওই মেয়ের ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়। ইসলাম এটিকে বাতিল করে দিয়েছে। ইসলাম এসব বিয়ে স্বীকার করে না। এ ক্ষেত্রে মা ফাতিমা ও হজরত আলির বিয়ের কথা স্মরণ রাখা যেতে পারে। রাসূল ﷺ-এর কাছে আলি رضي الله عنه যখন ফাতিমার পাণিপ্রার্থী হলেন, রাসূল ﷺ মা ফাতিমা رضي الله عنها-এর অনুমতি চাইলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুমারী মেয়েদের ক্ষেত্রে পিতাকে যে সীমিত ভেটোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে– ওই নারীটি যাতে কোনোভাবে প্রতারিত বা বঞ্চিত না হয়। তার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন তাকে বিপথগামী না করে, ঠকিয়ে না দেয়– তা নিশ্চিত করা। এমনও তো হয়, একজন শারীরিকভাবে প্রবল লোক শিক্ষা, সম্পদ, পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয়কে ব্যবহার করে ফুসলিয়ে একজন কুমারীকে বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে সারা জীবনের জন্য তাকে এক পীড়াদায়ক, কষ্টকর ও অসহনীয় জীবনের নিগড়ে বন্দি করে রাখে। ইসলাম সেখান থেকে বাঁচানোর জন্যই এ ব্যবস্থা রেখেছে।

আইনগত অধিকার : ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক অধিকারসমূহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে নারীর আইনগত অধিকারসমূহ। একজন নারী আদালতে স্বাধীনভাবে মামলা করতে পারে। আদালতের রায় কার্যকর করতে পারে, এমনকী যদি তা তার স্বামী, বাবা বা তাদের দুজনের বিরুদ্ধেও যায়। ইসলাম এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ করেনি।

সামাজিক অধিকার : সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সমাজসেবা, পেশা ও কাজ নির্ধারণ, জ্ঞানার্জন, বিভিন্ন শিল্পকলায় আগ্রহ, হজ-এর মতো ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে এবং রাজনৈতিক সমাবেশে অংশগ্রহণে পুরুষের মতোই নারীর অধিকার রয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে নারী এসব অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল, কিংবা কেবল রাজপরিবার ও অভিজাত মহলের জন্য তা সংরক্ষিত ছিল।

ইসলাম নারীকে পুরুষের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে শর্ত কেবল কয়েকটি–

১. এসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ স্বামী, সন্তান ও অন্যদের প্রতি তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালনে বাধা হবে না।

২. একজন নারী হিসেবে তার যে প্রাকৃতিক সৌকর্য তা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না।

২. নারীর বিশেষ অধিকার

নারীর স্বভাব-প্রকৃতি, সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বকে বিবেচনা করে ইসলাম উপরোল্লিখিত সাধারণ (common) অধিকারের পাশাপাশি কতিপয় বিশেষ অধিকার নিশ্চিত করেছে। উল্লেখ্য, নারীর ওপর কিছু বিশেষ দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতাও রয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশেষ অধিকারসমূহ আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. আর্থিক অধিকার খ. নৈতিক অধিকার।

ক. আর্থিক অধিকার

মোহর : নারীর একটি বিশেষ আর্থিক অধিকার হচ্ছে মোহর। কাবিননামায় উল্লেখ থাকুক আর না থাকুক স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে বিয়ের সাথে সাথে স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা। কুরআন বলছে–

'নারীদের উপহার হিসেবে মোহর প্রদান করো।' সূরা নিসা : ৪

ইসলামে মোহর হচ্ছে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং প্রতিশ্রুতির প্রতীক।

পৌত্তলিক মতে, স্বামী হবু শ্বশুরকে 'দুধমূল্য' বাবদ এককালীন একটি অর্থমূল্য দিতেন। এর মধ্য দিয়ে স্ত্রীকে তার বাবার কাছ থেকে কিনে স্বামী তার মালিক বনে যেতেন। ফলে স্ত্রীকে অমর্যাদাকর এক বন্দিত্বকে মেনে নিতে হতো। আর ইসলাম যে মোহরের কথা বলেছে তা হলো–

- মোহর নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মানস্বরূপ তাকে একান্তভাবে দেওয়া হয়। মূল্য হিসেবে তার আত্মীয়দের দেওয়া হয় না।
- নারীর সম্মান ও মর্যাদা বিবেচনা করে একটি উপহার ও উপঢৌকন হিসেবে মোহর দেওয়া হয়। ভালোবাসার লোকের প্রতি এটি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার প্রতীক।
- এ অর্থ ও সম্পত্তি নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে তার অধিকার ও মালিকানায় চলে যায়।
- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি মাত্র সাধারণ সম্পর্কের মতো নয়; বরং এটি স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত এক বিশেষ সম্পর্ক। মোহর আদায়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর প্রভু হিসেবে আবির্ভূত হন না; বরং তাঁর হৃদয় জয় করেন। এ জন্য এটি অফেরতযোগ্য উপহার। স্বামীর দ্বারা সম্পর্কচ্ছেদ হলে স্ত্রীর নিকট থেকে মোহর ফেরত নিতে পারবে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে স্ত্রী মোহর ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।

খোরপোশ : স্ত্রীর খোরপোশ আদায় করা স্বামীর একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য এবং তা নারীর একটি বিশেষ অধিকার। খোরপোশ হলো– সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও পরিবারের সদস্য হিসেবে স্ত্রীর জন্য স্বাভাবিক খাদ্য, পোশাক, আবাসন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা। বিদায় হজে রাসূল ﷺ বলেছেন–

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আর তোমাদের নারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তাদের তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ। আল্লাহর নির্দেশেই তাদের থেকে উপকৃত হচ্ছো। তাদের ওপর তোমাদের জন্য হক হচ্ছে- তারা যেন তোমাদের অন্দরমহলে এমন কোনো লোককে যেতে না দেয়, যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এমন কাজ করে, তবে তাদের সামান্য শাস্তির সম্মুখীন করবে। আর তোমাদের ওপর তাদের হক হচ্ছে, তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের পোশাক ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।' ইবনে মাজাহ : ৩০৭৪

মিত এ খোরপোশ ছাড়াও পরিবারের আর্থিক সম্পত্তি বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার ন বৃদ্ধি এবং পরিবারের সদস্যদের আরাম-আয়েশ বাড়ানোর জন্যও পুরুষকে া সচেষ্ট থাকতে হয়।

নৈতিক অধিকার

লো আচরণ : নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পারিবারিক, সামাজিক শৃঙ্খলা ও ম্প্রীতির লক্ষ্যে পারস্পরিক ভালো আচরণ একটি অপরিহার্য বিষয়। পরও ইসলাম বিশেষ করে নারীর প্রতি সদয়, সদাচারী হতে এবং তাদের যে কোনোরূপ রূঢ় আচরণ করতে বারণ করেছে।

সূল আকরাম ﷺ বলেছেন–

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যখন কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করবে, তখন হয়তো উত্তম কথা বলবে, অন্যথায় চুপ থাকবে। আর তোমরা নারীদের ক্ষেত্রে কল্যাণের অঙ্গীকার করো। কারণ, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাজরের একটি হাঁড় থেকে। আর পাজরের সবচেয়ে বেশি বাঁকা হলো তার ওপরের অংশ। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙে যাবে। আর তাকে (এমনিতেই) ছেড়ে দিলে তা সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। নারীদের ক্ষেত্রে কল্যাণের অঙ্গীকার গ্রহণ করো।' মুসলিম : ১৪৬৮

ন্য হাদিসে আছে–

'দুনিয়াটা পুরোটাই উপকরণ-নির্ভর। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম উপকরণ হচ্ছে, উত্তম রমণী।' মুসলিম : ৩৪১৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূরা বাকারা (২২৯-২৩১) ও সূরা আহজাবে (৪৯) বিভিন্ন আয়াতে সবিস্তারে এসেছে যে, স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা না হলে এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহবিচ্ছেদ পর্যায়ে চলে গেলেও তা যেন হয় ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে সদাচারসহ। যেন সুখ-স্মৃতিগুলো তাদের মাঝে থেকে যায়। পুরুষকে স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো আর্থিক দাবি, তার প্রতি নির্যাতন কিংবা নানাভাবে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

বিশ্রাম ও সেবা পাওয়ার অধিকার : পুরুষকে বাধ্য করা হয়েছে নারীর আরাম নিশ্চিত করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে নারী স্বামীর বাড়ির কাজ করতে ও তাকে সেবা দিতে বাধ্য নয়, যদিও কোনো নারীই প্রকৃতিগতভাবে গৃহস্থালি কাজ পরিহার করতে আগ্রহী নন। এমনকী এ কাজ পরিত্যাগ করাটা তিনি সহ্য করতে এবং তা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখুক, তা মেনে নিতে পারেন না। মজার কথা হচ্ছে– ঘরের কাজ থেকে বিরত রাখা এবং পারিবারিক বিষয়ে তার মতকে উপেক্ষা করার চেয়ে মানসিক পীড়ন তার কাছে আর কিছুই নেই। বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নারী স্বেচ্ছায় বাদির মতো স্বামীর খেদমত করেন। নারী কিন্তু আইনগতভাবে এভাবে পরিশ্রম করতে বাধ্য নন। ইসলাম নারীর জন্য এ গ্যারান্টি প্রদান করেছে। এ বিধান করে নারীকে ভারবাহী স্তর থেকে মর্যাদাবান ভদ্র মহিলা, ক্রীতদাসী থেকে মুক্ত স্বাধীন মানুষে উন্নীত করেছে। তবে হ্যাঁ, নারীকেও তার সদাচার ও নৈতিকতার মাধ্যমে এ ধরনের একটি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

রাসূলে আকরাম ﷺ সৎ নারীকে পৃথিবীর বুকে একজন ব্যক্তির চার সৌভাগ্যের একটি বলেও উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিব্বান : ৪০৩২

আধুনিককালে মানবাধিকার আইনে নারীর জন্য খোরপোশ ও গর্ভধারণকালে নির্দিষ্ট সময়ে মাতৃত্ব ছুটির ব্যবস্থা করলেও সর্বত্র নারী ও পুরুষকে অন্য সকল ক্ষেত্রে এক করে দেখার কথা বলা আছে। (ধারা ২৩, অনুচ্ছেদ- ৬ এবং ধারা ২৫. অনুচ্ছেদ ১ ও ২)

দাম্পত্য অধিকার : পুরুষের ওপর নারীর একটি অধিকার হলো, তাকে স্বামীর সঙ্গে সহবাস এবং একই বিছানায় থাকার অধিকার দিতে হবে। এমনকী একাধিক স্ত্রী থাকলেও পুরুষের এ অধিকার নেই যে, তিনি কাউকে রাত্রিকালীন এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। ইসলামি বিধান মতে–

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ত্রীকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে তাকে সঙ্গবঞ্চিত করলে স্বামীকে অর্থদণ্ড করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর তা নাহলে বিচ্ছেদের পথে যেতে হবে।

পুরুষ যদি সঙ্গ দিতে ব্যর্থ হন, শারীরিকভাবে অক্ষম হন, ইসলাম নারীকে বিবাহ বাতিল করার অধিকার দেয়।

এমনকী অতিমাত্রায় তাকওয়া ও ইবাদাত করতে গিয়ে কেউ যখন নিজের স্ত্রীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখছিলেন, রাসূল ﷺ তাকে স্ত্রীর অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সচেতন করেছিলেন।

ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারী স্বামীর ওপর সকল স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্কসহ সকল প্রকার অধিকারের সমতা বিধান করতে বলা হয়েছে।

নারীর কর্তব্য

আমরা জানি ও মানি, যেখানে অধিকার রয়েছে সেখানে রয়েছে দায়িত্বের প্রশ্ন। যেহেতু নারীরা সাধারণ অধিকারের পাশাপাশি পুরুষদের ওপর বিশেষ অধিকার লাভ করেন, সেহেতু তারা পুরুষদের ব্যাপারে সামান্য কিছু বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। এটাকে আমরা পুরুষের বিশেষ অধিকার হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হলো–

পতিভক্তি : এটি হচ্ছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য। তার অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহত্যাগ বা এমন কোনো কাজ না করা, যা পুরুষের বিশেষ অধিকার খর্ব করে। প্রশ্ন হতে পারে– নারীকে যেখানে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সেখানে এ ধরনের একটি বাধ্যবাধকতা আরোপ কি ঠিক? মূলত এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং দাম্পত্য জীবনের শান্তির জন্য একটি কাম্য বিষয়।

পুরুষ ও নারীর মাঝে এমনিতেই প্রকৃতিগত ও স্বভাবগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাবে না। তার অনুমতি ব্যতিরেকে নিজেকে তার নাগালের বাইরে রাখবে না। যদি নারী এরূপ করেন, তাহলে পুরুষও কিছু কিছু আর্থিক দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে পারবেন। এ জন্য নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এমন কোনো কাজ করবে না, যা স্বামীর অধিকারের পথে বাধা হবে। প্রয়োজনে নফল রোজা/নামাজ পরিত্যাগ করতে হবে। এমনকী পুরুষের অধিকার নষ্ট করে ফরজ নামাজ দীর্ঘায়িত করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সতীত্ব : স্বামীর কাছে নারীর সবচেয়ে মর্যাদার বস্তু হলো সতীত্ব এবং এটা নারীর ব্যক্তিত্বেরও বহিঃপ্রকাশ। এটি পুরুষের জন্য একটি মূল্যবান সেবা এবং মর্যাদার পাহারাদার।

নারীর সতীত্ব হচ্ছে তার ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়াস, যাতে বেগানা পুরুষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। সতীত্ব রক্ষার মাধ্যমে নারী তার স্বামীর বংশধারা বজায় রাখেন। এভাবেই তিনি মানবমর্যাদা বিনষ্টকারী চোর-ডাকাতদের হাত থেকে স্বামীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করেন।

ইসলাম বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এর সুরক্ষায় নিম্নরূপ বিধান দিয়েছে–

- পুরুষের চোখ থেকে নিজের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য নারীদের হিজাব, খিমার ও জেলবাব[৩] পরিধান করতে বলা হয়েছে।
- নারীকে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছে এবং প্রমাণিত হলে এর জন্য কঠিন শাস্তি অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যার ঘোষণা করেছে।
- নারীকে স্বামী ব্যতিরেকে আর কারও জন্য সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চা করতে বারণ করেছে।
- ইসলাম একজন নারীকে কোনো পুরুষের দিকে পাপের দৃষ্টিতে তাকাতেও নিষেধ করেছে, এমনকী লোকটি যদি অন্ধও হয়।

মুসনাদে আহমাদের একটা হাদিসে এসেছে, উম্মে সালামা ﵂ বর্ণনা করেন–

> 'একবার আমি ও মায়মুনা ﵂ রাসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় উম্মে মাকতুম ﵁ আগমন করলেন। তখনই রাসূল ﷺ আমাদের পর্দা করার আদেশ করলেন। আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! সে কি অন্ধ নয় যে, আমাদের না দেখতে পাবে আর না চিনতে পারবে?" তখন রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন : "তোমরা দুজনও কি অন্ধ হয়ে গেছ? তোমরা কি দেখতে পাও না?"'

---

৩. পর্দার পুনর্বার জন্য মহিলারা বোরকার ওপর যে বড়ো চাদর জড়িয়ে নেয়, তাকে জিলবাব বলে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নারী ও পুরুষের অধিকারবিষয়ক পার্থক্য

পাশ্চাত্য সমাজ ইসলামের 'পারিবারিক বন্ধন', যা কিনা আমাদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কল্যাণধারার প্রকাশ্য সোপান, তা বিনষ্ট করার জন্য বহুবিধ অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে। কতগুলো অপপ্রচারের উত্তর ওপরে বর্ণিত অধিকার, মর্যাদার আলোচনায় এসেছে। এখন রয়ে গেছে ওইসব বিষয়, যার বিধান পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন। এ নিয়ে আলাদা গ্রন্থ ও বিশাল বিশাল প্রবন্ধও হতে পারে। কেবল বিবেচনার জন্য এ বিষয়ে আমরা এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করছি।

পাঁচটি প্রধান বিষয়ে এই পার্থক্যসমূহ লক্ষ করা যায়। যেমন : উত্তরাধিকার, আদালতে সাক্ষ্য, রক্তপণ, তালাক এবং বহুবিবাহ। আল্লাহ মানুষের মেজাজ-মর্জি, প্রয়োজন, শারীরিক-মানসিক অবস্থা, তার ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই তিনি এসব বিবেচনা করে ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে এ পার্থক্যগুলো করেছেন।

ক. উত্তরাধিকারবিষয়ক পার্থক্য

এ বিষয়ে শুরুতেই আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই দুটো কথা।

১. ইসলামপূর্বযুগে নারীর কোনো উত্তরাধিকার ছিল না; বরং সে নিজেই সম্পদের মতো উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টিত হতো।

২. এ অবস্থায় কুরআনে বর্ণিত, একজন পুরুষ দুজন নারীর সমান অংশ উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে। এই আয়াত সম্পর্কে না বুঝেই ধারণাবশত অনেকে বিরূপ মন্তব্য করে। বলা হয়ে থাকে, ইসলাম এভাবে নারীকে সম্পদের ব্যাপারে ঠকিয়েছে।

ইসলামে সম্পদের উত্তরাধিকার ঠিক করার ক্ষেত্রে সম্পর্ককে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। ইসলাম নারীকে অনেক উৎস থেকে সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তার ওপর তেমন কোনো আর্থিক দায়িত্ব রাখেনি। অপরদিকে পুরুষের ওপর রয়েছে অনেক দায়িত্ব। তাই পুরুষের চেয়ে নারীর আর্থিক পরিমাণটা কম হওয়াটা মোটেও দোষণীয় নয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নারীর আর্থিক সুবিধা

- বিয়ের আগে বাপদানে নারী যা উপহার পায়, সবই তার।
- নারী বিয়ের সময় মোহর পায়, যা হয় নগদ অর্থ কিংবা বিক্রয়যোগ্য সম্পদ। যেমন– স্বর্ণ। এটা নারীর নিজের সম্পত্তি।
- বিয়ের পূর্ব থেকে নারীর যে সম্পদ থাকে, তা তাঁরই থেকে যায়। স্বামী তা দাবি করতে পারেন না।
- স্ত্রী-স্বামীর চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হলেও তার সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সকল খরচের দায়-দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর ওপর সাংসারিক খরচের দায়-দায়িত্ব নেই।
- বিবাহিত জীবনে অনুমোদিত চাকরি, ব্যবসায় বা অন্য কোনো মাধ্যমে যা আয় করেন, তা সবই নারীর। পুরুষ সেই সম্পদের অংশীদার নন।
- কোনো কারণে 'তালাক' হলে নারী তাৎক্ষণিকভাবে মোহরের বাকি অংশ পেয়ে যান।
- তালাকের পর ইদ্দতকালে পুরো খোরপোশ এবং পরবর্তী সময়ে সন্তানদের ভরণ-পোষণের খরচ পেতে থাকবে।
- কোনো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার বণ্টনের সময়, পুরুষের চেয়ে যদি নারী অধিকতর কাছের আত্মীয় হয়, তাহলে পুরুষ কোনো অংশই পাবে না।

আল্লামা তাবাতাবায়ি তাফসিরে বিষয়টিকে এভাবে এনেছেন–

> 'সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই নিয়মের রহস্যটি হলো– সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পায় এ কথা ঠিক, অনুরূপ সম্পদ ভোগ করার ক্ষেত্রে নারী দ্বিগুণ ভোগ করেন। কারণ, নারী তার প্রাপ্ত অংশ জমিয়ে রাখেন আর পুরুষ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খরচ বহন করেন, যাতে তার সম্পদের একটা বড়ো অংশ চলে যায়। নারী তার ছেলের সম্পদেও অংশ পান, যদি কোনো কারণে ছেলে সম্পদ রেখে মারা যায়।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম শাফিয়ের মতে-

'সম্পদের উত্তরাধিকারে নারীর চেয়ে পুরুষের অংশ দ্বিগুণ। কেননা, নারীকে যুদ্ধে যেতে হয় না, জাতীয় নিরাপত্তায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হয় না। অথচ নারীর খোরপোশের দায়িত্ব পুরুষের, মোহরানাও পুরুষকেই আদায় করতে হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই রক্তপণের টাকাও নারীকে নয়; পুরুষকেই আদায় করতে হয়।'

ওপরের সবগুলো বিষয় সামনে রেখে বিবেচনা করলে যে কেউ এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারবেন।

খ. আদালতে সাক্ষী

ইসলামি আইনে নারী ও পুরুষের সাক্ষ্য সব সময় সমান নয়। বিশেষ করে অভিভাকত্ব, তালাক, চাঁদ দেখা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে শুধু নারীর সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়।

আদালতে বিচারাধীন বিষয় প্রমাণের জন্য যেখানে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য যথেষ্ট, সেখানে দ্বিগুণ নারীর সাক্ষ্য অপরিহার্য। অর্থাৎ দুজন নারীর সাক্ষ্য সমান একজন পুরুষের সাক্ষ্য। ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণের জন্য আদালতে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য (চারজন নারী-পুরুষ হলেও চলে) যথেষ্ট, কিন্তু সাক্ষীগণ কেবল নারী হলে প্রমাণিত হবে না।

এ বিষয়টিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এভাবেই ইসলাম নারীর অধিকার খর্ব করেছে এবং তাকে খাটো করে দেখছে।

হ্যাঁ, এ ধরনের দ্রুত মত প্রদান এ জন্যই সম্ভব যে, লোকেরা সৃষ্টি রহস্য এবং এ ধরনের বিধানের অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ। আমরা বিষয়টিকে এভাবে বিবেচনা করতে পারি।

প্রথমত : সাক্ষ্য কোনো অধিকার নয়; বরং বাধ্য-বাধকতা। কেউ যদি সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়, তখন তাকে সব সত্য বলতে হয়। ইসলামে সাক্ষ্য গোপন করা বা সত্য আড়াল করা নিষিদ্ধ। সূরা বাকারা : ২৮২

সুতরাং, সাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি মানেই ব্যক্তির দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া। এভাবেই নারীসাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদের দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয়ত : অধিকারসংক্রান্ত দর্শন, অপরাধবিদ্যার নীতিমালা ও পদ্ধতি এবং এ বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিকদের আলোচনায় এটি প্রমাণিত– একটি ঘটনার বিভিন্ন সাক্ষীর ভাষা ও বক্তব্য ভিন্ন হতে পারে। এটি একজন নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-ভেদে ভিন্ন হতে পারে। কারণ, এদের প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ও আত্মোপলব্ধি এক নয়। দেখা গেছে, ভাবাবেগে আক্রান্ত ও কল্পনাশ্রয়ী ব্যক্তির বক্তব্যে অনেক পরিবর্তন হয়। নারীদের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য, তারা ভাবাবেগ ও কল্পনা দ্বারা অধিক প্রভাবিত হন। এটি তাদের দোষ নয়; প্রকৃতি। সুতরাং, জটিল ও কঠিন বিষয়গুলোতে নারীর সাক্ষ্য বেশি হওয়া শ্রেয়।

তৃতীয়ত : যদি দুজন নারী সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান বিবেচনা করার বিষয়টিকে ইসলামে নারীর প্রতি অসম্মানের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে যেখানে প্রমাণের ক্ষেত্রে পুরুষের সাক্ষ্য মোটেই কার্যকর নয়, সেখানে কী বলা হবে? এমনও বিষয় আছে যেখানে প্রতিজন নারীর সাক্ষ্য বিষয়টির এক চতুর্থাংশ প্রমাণ করে। কিন্তু, পুরুষের সাক্ষ্যের কোনো গুরুত্ব নেই।

সম্পত্তির অছিয়ত (Willeded property)-এর ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষী মানে এক চতুর্থাংশ প্রমাণ, এভাবে চারজন নারী সাক্ষী দিলে বিষয়টি প্রমাণিত হবে। অনুরূপভাবে, শিশু জন্মের সময় জীবিত কিংবা মৃত প্রশ্নে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। শিশুর উত্তরাধিকার প্রমাণের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষী কোনো কাজেই লাগে না। অন্যদিকে একজন নারীর সাক্ষী শিশুর এক চতুর্থাংশ উত্তরাধিকার প্রমাণ করবে। এ নিয়মের ফলে পুরুষের চেয়ে নারীর মর্যাদা বহুলাংশে বেড়ে যায়।

চতুর্থত : কোনো কোনো বিষয়ে কেবল নারীর সাক্ষীই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য, পুরুষের সাক্ষী সেখানে নিষ্প্রয়োজন কিংবা অবাস্তব। জন্ম, কুমারীত্ব কিংবা কোনো নারীর যৌন প্রতিবন্ধিত্ব প্রমাণ করার ক্ষেত্রে একমাত্র নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণ করা হয়। এমনও বিষয় আছে– যে ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষীই যথেষ্ট।

পঞ্চমত : সাক্ষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্ত হচ্ছে– পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত, নিরপেক্ষ ও সৎ হওয়া। তাকে সত্যবাদী ও প্রত্যয়ী হতে হবে। আবার, কোনো নারীর ব্যক্তিত্ব ও আস্থা প্রশ্নবোধক হলে তাকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।

ওপরের বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে দেখা যায়– ইসলামের সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে শরিয়তপ্রণেতাগণ দুটো বিষয়কে বিবেচনায় এনেছেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমত : যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, সে বিষয়ে সাক্ষীর নিশ্চিত নির্ভরতা থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত : বিষয়টি প্রমাণের জন্য সাক্ষীর জ্ঞাত ও সঠিক তথ্য প্রদান। সেখানে সাক্ষীর কোনো ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা, ব্যক্তিগত ক্ষতিকে বাঁচানোর প্রবণতা এবং কারও সাথে পূর্বশত্রুতা উদ্ধারের অন্যায় ইচ্ছা কাজ করবে না। সে জন্যই চাকর-বাকর, ভাড়াটিয়া-ভাড়াটে সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ লোকদের সাক্ষ্য পরিহার করা হয়। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি বিবেচনায় এনেছেন।

গ. রক্তপণের ক্ষেত্রে

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তির প্রাণহানি বা অঙ্গ কর্তনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে অর্থদণ্ড প্রদান করে, তাকে রক্তপণ বলে। এ জরিমানা সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীদের কাছে দিতে হয়। বিধান অনুযায়ী, একজন নিহত মুসলিম নারীর রক্তপণ একজন পুরুষের রক্তপণের অর্ধেক। আঘাতের ক্ষেত্রে পণের অর্থ যদি মোট ক্ষতির এক তৃতীয়াংশ হয়, তাহলে পুরুষ-নারীর সমান হবে। অর্ধেকের বেশি হলে তা পুরুষের অর্ধেক হবে।

সমালোচকদের মতে– এভাবেই ইসলাম নারীর ব্যক্তিত্ব ও অধিকার খর্ব করেছে। এর প্রধান কারণ, এসব লোক সাধারণ আইনের দর্শন এবং ইসলামি দণ্ড আইনের দর্শনকে একই সমতলে না রেখে এ দুয়ের ঐক্যগুলোকে বিবেচনায় না এনেই মন্তব্য করেন। এ ধরনের সমালোচনা যেমন অবৈজ্ঞানিক, তেমনি প্রজ্ঞার বিচারেও বেঠিক।

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইসলামি আইনে নারী পুরুষের মতোই মানবাধিকার লাভ করে থাকেন। তবে ইসলামি আইন নারীর স্বভাবগত কারণে তার সাথে পুরুষের যে সামাজিক ও কার্যগত পার্থক্য তাও বিবেচনায় রাখে। এসব সমালোচক সার্বিক বিবেচনায় নারী-পুরুষের অধিকারের ছোটো ছোটো তারতম্যকে বড়ো করে দেখে বিরক্তি, অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। তারা একবারও বিবেচনায় আনেন না যে ইসলাম মোহর, খোরপোশসহ অনেকগুলো আর্থিক বিষয় পুরুষের ওপর বর্তিয়েছে, নারীর ওপর নয়।

অপরদিকে, রক্তপণ আদায়কারীর আত্মীয়দের পক্ষ থেকে তা আদায়ের দায়িত্ব কোনো নারীকে দেওয়া হয় না; বরং নারীকে এর জন্য অনুপযুক্ত (immature) মনে করা হয়। এটি নারীর জন্য একটি বড়ো ধরনের আর্থিক সুবিধা এবং সঙ্গতও এ কারণেই নিহত পুরুষের পরিবারের প্রতি অধিকতর রক্তপণ আদায় করতে হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, পুরুষরা সাধারণত পরিবারের মুখ্য উপার্জনকারী হয়ে থাকেন। তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে একজন পুরুষ নিহত বা আহত হলে তার পরিবারকে অধিকতর আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। এও মনে রাখা দরকার, রক্তপণ নিহত বা আহতের মূল্য নয়; বরং এটি হলো পরিবারের প্রতি অপরাধী বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের একটি ব্যবস্থা। এ বিবেচনা করলে, সমালোচনার পরিবর্তে রক্তপণের এ বিধান ও পার্থক্যটি প্রশংসা পেতে বাধ্য।

ঘ. তালাক

ইসলাম নারীর প্রতি বৈষম্য করেছে– এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে যেটাকে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, তা হলো– ইসলামে কেন একজন নারীকে তালাকের অধিকার দেওয়া হয়নি, যেখানে একজন পুরুষকে তা দেওয়া হয়েছে? এর সহজ-সরল উত্তর হতে পারে, নারী-পুরুষের স্বভাবজাত পার্থক্য সামনে রেখেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ ধরনের একটি বিধান প্রদান করেছেন। তবুও যুক্তির জন্য, উপলব্ধির জন্য নিচের বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো।

প্রথমত : ইসলামের চোখে তালাক একটি ঘৃণিত কাজ। রাসূল ﷺ বলেছেন–

> 'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে হালাল জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত হচ্ছে তালাক।' ইবনে মাজাহ : ২১৭৮

ইসলাম চায় পরিবারের ভুল বোঝাবুঝি দূর হোক। দম্পতিদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় থাকুক, পরিবার ও পারিবারিক কাঠামোতে নেতিবাচক বিষয়গুলোর চর্চা বন্ধ হয়ে যাক। ইসলামি বিধানে পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতিগুলো স্বার্থহীন ও পরিষ্কার। বিচ্ছেদ ও পারিবারিক জীবনের স্বস্তি ব্যাহত হওয়াটা যাতে রোধ করা যায় এটিই তালাকের লক্ষ্য।

তালাক কেবল এ ধরনের পরিস্থিতির সর্বশেষ চিকিৎসা।

দ্বিতীয়ত : তালাক হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর আবেগ, ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝি এবং দুজনের মনের অমিলের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। দেখা যায়, ভাবাবেগের গভীরতা ও যুক্তির অভাব এই বিরোধের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। শরিয়ত চেষ্টা করেছে এমন এক বিধান প্রণয়ন করতে, যাতে পারিবারিক বিষয়সমূহে অন্ধ ভাবাবেগ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বা আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত প্রাধান্য না পায়, যুক্তি ও বুদ্ধি দম্পতিদের আবেগকে কমিয়ে এনে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি থেকে হঠাৎ একটি পরিবার ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ধন-জনের ব্যাপক ক্ষতি না করে বসে।

তালাক-প্রসঙ্গে ইসলামি মূলনীতিগুলো গভীরভাবে দেখলে যে বিষয়টি উপলব্ধি হবে তা হচ্ছে– তালাকের ক্ষেত্রে বুদ্ধি, যুক্তি ও কার্যকরণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আবেগ, মেজাজ, দুশমনি ও হিংসার বশবর্তী হয়ে সমাজে অহরহ 'তালাকের' ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই নারী পুরুষের চেয়ে আবেগী, রাগী, প্রতিশোধ ও ঘৃণায় অভ্যস্ত। এমনিভাবে অনেক পুরুষের মাঝেও অল্পতেই রেগে যাওয়া অভ্যাস প্রবল। পশ্চিমা জগতে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ৮০% তালাকই নারীদের আবেদনের কারণে কার্যকর হয়। সাধারণত পুরুষরা অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আত্মবোধসম্পন্ন এবং হিসেবি হয়ে থাকে। রাগের বশবর্তী বা ভাবাবেগ আশ্রয়ী সিদ্ধান্ত থেকে তারা তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে। যাই হোক– তারপরও যদি কোনো পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর অনুতপ্ত হয়, তাহলে ইসলাম নারীর সম্মান এবং একটি পরিবারকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রেখেছে; যা মেনে চললে অনেক বিপর্যয় থেকেই বেঁচে থাকা সম্ভব।

তৃতীয়ত : বিবাহবন্ধন কেবল একটি আইনি বন্ধন নয়; সেখানে হৃদয়ের এক গভীর বন্ধন, ভালোবাসা ও স্নেহের তীব্র আকর্ষণ সতত ক্রিয়াশীল। আকর্ষণ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় ভরপুর এ বন্ধন কেবল বাধ্যবাধকতা, আধিপত্য, মুক্তি বা বিচ্যুতির সমষ্টি নয়। তালাকের ক্ষেত্রে যদি উভয়ের সম্মতিকে বাধ্যবাধকতা করা হতো, তাহলে মূলত স্বামীকে একটি ভালোবাসাহীন সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য করা হতো। একটি প্রাকৃতিক বিষয় এখানে বিবেচনা করা দরকার। একজন পুরুষ শারীরিক, যৌন সামর্থ্য ও অন্তর্গত আবেগ ছাড়া তার স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ প্রকাশ করতে পারে না। অপরদিকে, একজন নারী এসব ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অভাব নিয়েও যথাযথভাবে সাড়া দিতে পারে।

একজন বিশেষজ্ঞের মতে– দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রধান বিবেচনা নারীর দেহ, আর নারীর বিবেচনা পুরুষের হৃদয়ের উত্তাপ। নারী মা হন, সন্তান ধারণ করেন, জন্মের পর মাতৃত্বের সব ক্ষমতা দিয়ে তাকে লালন-পালন করেন, কিংবা অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন– তার প্রধান তাড়না পুরুষের প্রতি তার ভালোবাসা এবং আবেগ। পুরুষের ভালোবাসাবঞ্চিত নারী ঘর, সন্তান ও সম্পদ সবকিছুকেই ঘৃণা করতে থাকে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অথচ, পুরুষ আইনের চোখে কোনো ভালোবাসা, আকর্ষণ, স্নেহ ব্যতিরেকেও একজন নারীর দেহের আকর্ষণে ছুটে যেতে লজ্জাবোধ করে না। আর যে পুরুষ তার প্রতি কোনো ভালোবাসা পোষণ করে না, নারী তার সাথে বসবাস করাকে তীব্র অবমাননা বলেই ধরে নেন। সুতরাং নারীর জন্য এটাই কল্যাণকর যে, ভালোবাসাবঞ্চিত প্রাচুর্যসিক্ত জীবনের চেয়ে তিনি তালাককে গ্রহণ করে নেবেন।

চতুর্থ : ইসলাম নারীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দেয়, তবে কখন ও কীভাবে তা– প্রণিধানযোগ্য। এখানে রয়েছে– একক তালাক প্রদানের অধিকার, আদালতের মাধ্যমে তালাক প্রাপ্তির অধিকার এবং পরস্পরের সম্মতিতে তালাক।

এককভাবে স্ত্রীর তালাক দেওয়ার অধিকার

১. খেয়ার বা এখতিয়ার : বিয়ের সময় বা তার পরে স্বামী তার তালাকের একক অধিকার স্ত্রীকে দিয়ে দেওয়ার নাম খেয়ার।

২. মুকাইয়াদ বা শর্তযুক্ত অধিকার : এ ক্ষেত্রে কাবিননামা স্বাক্ষরের সময় স্ত্রী কিছু শর্ত দিতে পারে, যা ভঙ্গ হলে সে তালাক দিতে পারবে।

আদালতের মাধ্যমে তালাক প্রাপ্তির অধিকার

আদালতের মাধ্যমে যেসব প্রেক্ষিতে স্ত্রী তালাক চাইতে পারে :

- স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে অক্ষম হলে বা অস্বীকার করলে (স্ত্রী ধনী হলেও ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্ব)।
- দুর্ব্যবহার করলে (প্রহার করা, গালিগালাজ করা বা অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করা)।
- স্বামী পুরুষত্বহীন হলে (স্ত্রীর বৈধ যৌন চাহিদা পূরণে অক্ষম হলে)।
- স্থায়ী উন্মাদ কিংবা দুরারোগ্য ছোঁয়াছে রোগ হলে।
- দীর্ঘ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে (বাসস্থান জানা না থাকলে ৬ মাস থেকে ১ বছর অপেক্ষা করতে হবে)।
- স্বামীর দীর্ঘ দিনের জেল হলে।
- বিয়ের সময় স্বামী নিজের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিলে বা দুর্বলতা গোপন করলে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারস্পরিক সম্মতিতে তালাক

- খোলা তালাক : স্বামীর ব্যবহারে স্ত্রী অসুখী হলে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে ভীত হলে। এ অবস্থায় স্বামীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে তালাক নেওয়া।

প্রথমত : স্বামীর হাতে তালাকের একক ক্ষমতা থাকার স্বাভাবিক কারণ হলো, তালাকের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক চাপ, আর্থিক ও মানসিক বোঝা সবই পুরুষকে বহন করতে হয়। দেনমোহর প্রদান, বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের ব্যয় নির্বাহের সমস্ত দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে থাকে বিধায় তালাকের একক ক্ষমতা তারই থাকা উচিত। যদি সে এর আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক দায়িত্ব বহনে রাজি হয়।

তালাকের কারণে কী কী ক্ষতি হবে? মোহরানার প্রদেয় বাকির পরিমাণ কত, আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করলে কী পরিমাণ খরচ বাড়বে, স্ত্রীর অবর্তমানে সন্তানদের গড়ে তুলতে কী পরিমাণ আর্থিক ব্যয় যুক্ত হবে ইত্যাদি পুরুষকেই ভাবতে হয়। ফলে একক অধিকার পাওয়ার পাশাপাশি মূলত স্বামী বা পুরুষের একক দায়িত্বের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়।

বহুবিবাহ

কুরআন নারীর ক্ষেত্রে 'জাওজ' শব্দটি ব্যবহার করেছে, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এতে নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। ইসলামের বিধান মোতাবেক একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক নারীকে 'স্ত্রী' হিসেবে পেতে বা রাখতে পারেন, কিন্তু একজন নারী একাধিক পুরুষকে 'স্বামী' হিসেবে রাখতে পারেন না।

কোনো কোনো নারীবাদী ও 'মানবতাবাদী' এ বিধানটিকে একটি অসাম্য ও বিভেদের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে তারা কেউই জোর গলায় নারীর একাধিক স্বামী থাকার পক্ষে আওয়াজ তোলেননি। তাদের বক্তব্য হলো— পুরুষকে বহুবিবাহের (polygamy) অনুমতি দিয়ে ইসলাম ঠিক করেনি। প্রাচীনকালের দার্শনিকদের মতো (poltinos) মার্কসবাদে এবং তিব্বতের কিছু এলাকায় নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণের সীমিত অধিকারের উদাহরণ থাকলেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ইসলাম এটিকে অনুমোদন করে না :

- বহু স্বামী গ্রহণ নারীর স্বভাব-প্রকৃতি ও মেজাজের পরিপন্থি। পরপক্ষে নারীরা শস্যক্ষেতের মতো। অপরদিকে পুরুষরা চাষির মতো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চাষি একই সময়ে নানা রকম বীজ ভিন্ন ভিন্ন জমিতে বপন করতে পারে। কিন্তু একই জমি একসঙ্গে একাধিক ফসল ফলাতে পারে না। পারলেও শস্য কাঙ্ক্ষিত মানের হয় না। প্রাকৃতিক কারণে একজন নারী একই সাথে একাধিক পুরুষের সন্তান ধারণ করতে পারে না। অন্তত এক বছর তাকে একটি সন্তান ধারণ করতে হয়, যে কিনা একজনের বীর্য থেকে এসেছে। কারণ, সন্তানের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার হচ্ছে তার পিতৃপরিচয়।

ফলে, পুরুষের সান্নিধ্যে আসার পর সাধারণত একজন স্বামীর মাধ্যমেই নারীর স্বাভাবিক চাহিদা, মাতৃত্বের চাহিদা পূর্ণ হয়। ফলে অন্য পুরুষের জন্য তার ঘর বন্ধ করে দেওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুরুষের চাহিদা অফুরন্ত। কিছুটা ফুল থেকে ফুলে ঘুরে বেড়ানো প্রজাপতির মতো।

- একই সাথে একাধিক পুরুষের সম্ভোগলাভ নারীর দৈহিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হয়। যেমন : তাতে তার যৌনরোগ, দুর্বল বা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মদান, বন্ধ্যাত্ব, মানসিক ও স্নায়ু রোগ ইত্যাদি প্রকট হতে পারে।

- আমরা সকলেই স্বীকার করি, স্ত্রীর মাতৃত্ব সন্তানকে তার পিতৃপরিচয় নিশ্চিত করে দেওয়া। একাধিক স্বামী থাকলে সন্তানের কাছে তা প্রকাশ করা কঠিন এবং এতে সন্তানের মানসিক ও নৈতিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়াটাই স্বাভাবিক। সমাজ এর অন্যসব বিরূপ প্রভাবের মুখোমুখি পড়তে বাধ্য হবে।

এই বিষয়সমূহ বিবেচনা করেই বিশ্বের দেশ ও মতবাদসমূহ একাধিক স্বামী গ্রহণের কোনো অধিকার নারীর জন্য রাখেনি। এমনকী সমাজতান্ত্রিক বিশ্বও তাদের মুক্ত-নারীর ধারণা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

যাহোক, এর পাশাপাশি পুরুষদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার কোন কোন যুক্তিতে দেওয়া হয়েছে, তা বিবেচনার জন্য দেওয়া হলো–

- একাধিক স্ত্রী গ্রহণ পুরুষের প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ ও স্বাভাবিক। ততক্ষণ এটি মানব সমাজের কোনো ক্ষতি বা সমস্যার কারণ না হয়, ততক্ষণ ইসলাম তা নিষিদ্ধ করে না। যদিও প্রচলিত বিধান, প্রথা, রসম-রেওয়াজ অনুযায়ী এক বিবাহ অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কারও প্রয়োজন হলে শরিয়তের শর্ত মেনে অবশ্যই তা গ্রহণ করার অবকাশ আছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের শত্রুতার জন্য যারা এই বিধানের বিরোধিতা করে এবং অপপ্রচার চালায়, তাদের জানা উচিত– পৃথিবীতে ইসলামই প্রথম এটি চালু করেনি; এর ইসলামপূর্ব ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অসংখ্য নারীকে স্ত্রী, উপপত্নী কিংবা রক্ষিতা হিসেবে ভোগ-ব্যবহারের যে অসভ্য নিয়ম-নীতি ছিল, ইসলাম তাকে সীমিত সংখ্যক ও বৈধ স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

ইসলামের আগমনের সময় আরবদের মাঝে ১০ জনেরও বেশি স্ত্রী রাখার অধিকার ছিল। ইরান, রোম বা চীনের বাদশাহদের অধীনে তখন শত শত নারীকে স্ত্রী হিসেবে রাখা হতো।

ইসলাম এসে যেমন তার সংখ্যা সীমিত করেছে, তেমনি একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু পূর্বশর্ত আরোপ করেছে, যা নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় এক যুগান্তকারী ও বিপ্লবী পদক্ষেপ।

- বহুবিবাহের বৈধ অধিকার প্রদান সমাজকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে সহায়ক। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো কোনো দেশ ও সমাজে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। যেমন : বর্তমানে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকংসহ কিছু কিছু দেশ। আবার যুদ্ধ শেষে যুদ্ধে নিহত লোকদের স্ত্রীরা বিধবা হয়ে পড়েন। নারীরা তাড়াতাড়ি যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ায়ও এ সংখ্যায় তারতম্য দেখা দেয়। আবার নারীর চেয়ে পুরুষের মৃত্যুর হারও বেশি। কারণ, নারীরা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যায় না।

  এখন যদি পুরুষকে বহুবিবাহের বৈধ অধিকার দেওয়া না হয়, তাহলে যেখানে পুরুষ সংখ্যায় কম, সেখানে বহুসংখ্যক নারী স্বামীহীন থাকবেন। ফলে, সেখানে দুর্নীতি ও পতিতাবৃত্তি (নামে ও বেনামে) বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এতে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হবে, যৌন রোগসমূহ বাড়তে থাকবে এবং সমাজ এক ধরনের নরকে পরিণত হবে। এ জন্যই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বহু বিবাহের অধিকারটি একজন পুরুষকে দেওয়া হয়েছে; নারীকে নয়।

- অপর বিষয়টিও আমরা বিবেচনা করতে পারি। সব সময়ই সব সমাজের নারীরা স্বামীর একাধিক বিয়ের বিরোধী নয়। যারা স্বামীর দ্বিতীয় বা অন্য স্ত্রীদের নিজের শত্রু ও প্রতিপক্ষ ভাবেন, তারাই এর বিরোধিতা করেন। যে নারীর স্বামীগ্রহণ জরুরি, তার কাছে একজন পুরুষের পূর্ববিবাহে আপত্তি থাকার কারণ নেই। অর্থাৎ বিরাট সংখ্যক নারীর জন্য পুরুষের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই অধিকার একটি বড়ো সুযোগ। সামর্থ্যবান (অর্থ ও শারীরিক সক্ষমতা) পুরুষের ঘরে একাধিক স্ত্রীরা পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সঙ্গে বসবাস করেন।

- নারী যখন সন্তানসম্ভবা হন, গর্ভধারণ করেন, তখন লক্ষ করা যায়– অনেক নারীই পুরুষের সঙ্গ পছন্দ করেন না; বরং যৌন মিলনে অস্বস্তি অনুভব করেন এবং অনীহা প্রকাশ করেন। অনেক নারী এ সময়ে বেশ শক্ত অবস্থানও গ্রহণ করেন। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে এটি হয় না। ফলে তার যে স্বাভাবিক চাহিদা তা থেকে যায়। তাকে এটি ভুলে যেতে বা পরিহার করতে বাধ্য করা যায় না।

  এর সাথে আরও উল্লেখ্য যে, মাসিক ঋতুকালীন সময়ে নারী তার জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় যৌন-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকেন। অথচ পুরুষের এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আবার ৫০ বছর বয়স হয়ে গেলে নারীর সন্তানধারণ ক্ষমতা প্রাকৃতিকভাবেই বন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে একজন স্বামী/পুরুষ হয়তো আরও ১০/২০ বছর স্ত্রীসঙ্গ ও সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন।

- উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখলে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম বহুবিবাহকে একটি বাধ্যবাধকতা হিসেবে চাপায়নি; বরং সামগ্রিক প্রয়োজন, চাহিদা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে অনুমোদন প্রদান করেছে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন ও মানবিক চৈতন্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বহুবিবাহের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে– স্ত্রীদের মাঝে সাম্য ও সুবিচার বজায় রাখা। তাদের জাগতিক ও নৈতিক অধিকারসমূহ সমানভাবে নিশ্চিত করা। আল কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

  > 'যদি তোমরা আশঙ্কা করো, ইয়াতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্য মেয়েদের মধ্যে যাদের তোমাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করো দু-দুজন, তিন-তিনজন ও চার-চারজন করে। আর যদি আশঙ্কা করো যে, (একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে) সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একটিই বিয়ে করো অথবা তোমাদের মালিকানাধীন দাসীদের। এটাই তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হওয়ার নিকটতম পন্থা।' সূরা নিসা : ৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক আয়াতে, পরিষ্কার বলা হয়েছে, যদি পুরুষ মনে করে– তার দ্বারা স্ত্রীদের প্রতি সমতা বিধান ও সামগ্রিক চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়, তাহলে তার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অনুমোদিত নয়। এ কারণেই কুরআন মূলত একজন স্ত্রী গ্রহণেই উৎসাহ করেছে, বহুবিবাহের অনুমোদন রেখেছে প্রয়োজন পূরণের জন্য। অভিজ্ঞতার বহমত যে, অধিকাংশ মুসলিম পরিবারেই একজন স্ত্রী; অথচ পশ্চিমা বিশ্বে ঘরে একজন স্ত্রী থাকলেও, তারা নারী ও পুরুষ স্বাধীনতার নামে যৌন স্বেচ্ছাচারী, বহুগামী ও অসুখী।

নারী অধিকার

নারীর অধিকার নিয়ে বিশ্বে অনেক আইন, অনেক সম্মেলন, বহু সেমিনার, সিম্পোজিয়াম চারদিকে শোরগোল, হইচই পড়ে গেলেও প্রকৃত অর্থে তার অধিকারসমূহ আজও নিশ্চিত হয়নি বা হতে পারছে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, নারীর স্বভাব-প্রকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত বিষয়গুলো বিবেচনা করে তার জন্য মানানসই অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিয়েছে। নারীর প্রকৃত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে হলে একটি সামগ্রিক ইসলামি পরিবেশ লাগবে। আর তা হতে হলে রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে হবে। কারণ বিধান, আইন, শাস্তি, পুরস্কার– এ সবকিছুর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতার কোনো বিকল্প নেই।

আজ নারী জাতির এক বিরাট অংশ পশ্চিমা ও ইহুদিবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মনে করছে, নারীবাদী (feminist) হওয়ার মাঝেই তার কল্যাণ। এই সুযোগে স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের নামে নারীর নারীত্ব নিয়ে বাণিজ্যে মেতে উঠেছে কুৎসিত বাণিজ্যের ধারকরা, যার কোনো নৈতিক বা সামাজিক স্বীকৃতি ইসলামে নেই। এরা নারীকে সস্তা পণ্যে পরিণত করেছে। এ অবস্থায় নারীকে তার অবস্থান উপলব্ধি করতে হবে। আত্মমর্যাদা, স্বকীয়তা ও সম্ভ্রমকে বড়ো করে ভাবতে হবে। কেবল অর্থ, বিত্ত, সম্ভোগ, চোখ ধাঁধানো ভোগবাদী ঐশ্বর্য নয়; তাকে মা, মেয়ে ও স্ত্রীর সুমহান নারীসুলভ বিশুদ্ধতার কাছে ফিরে যেতে হবে।

তাহলেই আশা করা যায় নারীর অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম রাষ্ট্র এবং চিন্তাশীলদের দায়িত্ব

এক. নারীর জন্য ইসলামপ্রদত্ত অধিকারসমূহ নানা কারণে নিশ্চিত হয়নি। মুসলিম শাসক, আলেম ও ফকিহগণ চোখ বুজে সমালোচনা শুনে গেছেন এবং যাচ্ছেন। শুধু কতিপয় মুসলিম দেশ তাদের স্ব-স্ব দেশে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' সংশোধন, সংস্কার ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের আলেমসমাজ, ফকিহ ও বোদ্ধাদের সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করে নারীর ব্যাপারে ইসলামপ্রদত্ত অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আলোচনা-পর্যালোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে।

দুই. নারীর সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার অধিকার, সীমা ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ে এখনও অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। তাকে তার সীমা বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্যেই যে কল্যাণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এগুলো এখন ভাবার ও বোঝানোর বিষয়। সুতরাং অনীহা না নিয়ে এসব বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। নারীর বিভ্রান্তির অবকাশগুলো দূর করা দরকার।

তিন. মুসলিম পণ্ডিত, ফকিহ এবং ইসলামি নেতৃত্ববৃন্দকে নারীবিষয়ক প্রশ্নগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য, সহজ ও মধ্যপন্থি জবাব প্রস্তুত করতে হবে। নিকাব, হিজাব, খিমার (মাথার বড়ো ওড়না) ও জেলবাবের মতো বিষয়ে বাড়াবাড়ি পরিহার করে মতের ভিন্নতাকে সম্মান করতে হবে। আসল কথা হলো আমাদের উপলব্ধি। প্রতিটি বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা (dimension) ও প্রেক্ষিত (perspective) রয়েছে, যা বিবেচনা করা ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ পক্ষপাতদুষ্ট, অনিরপেক্ষ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ হয়ে যেতে পারে।

বিবেকের দরজা উন্মুক্ত রেখে নারীর অধিকার সম্পর্কে যেমন সজাগ থাকার সময় এটি, তেমনি সময় হলো বিভ্রান্তির কবল থেকে আমাদের নারীসমাজকে রক্ষা করা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় পর্ব

ইতিহাসের পথে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসের সাথে ঐতিহ্যের পথে

ইতিহাস কালের সাক্ষী

কাল অজস্র মুহূর্তের সমষ্টি। প্রতিটি মুহূর্তই ধাবমান। যা বর্তমান, তা যেন একটি প্রহেলিকা। বলতে না বলতেই বর্তমান হয়ে যায় অতীতকাল। মহাকালের এক একটি মুহূর্ত তো দূরের কথা, একটি বছরও যেন একটি বুদবুদ কিংবা অতিক্ষুদ্র বিন্দুর মতো। এই যে মহাকালের গর্ভে অসংখ্য সময় হারিয়ে গেছে, তার সাথে স্থান করে নিয়েছে অজস্র ঘটনাপ্রবাহ।

পৃথিবীতে মানুষের আগমন যত প্রাচীন, তার ইতিহাসও ততটাই পুরোনো। ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষকগণ প্রাগৈতিহাসিক বলতে একটি পরিভাষা ব্যবহার করেন। বাস্তবে তেমন কিছু থাকার সুযোগ নেই। হতে পারে মানুষের রচিত ইতিহাস যা ধারণ করতে পারেনি, তাকে আমরা ইতিহাসের অংশ মনে করছি না। কিন্তু আল কুরআনের 'ইতিহাস পর্ব' এ ধারণা নাকচ করে দেয়। আমরা বিজ্ঞানের যে যুগ অতিক্রম করছি, তা অতীতকে হাতড়ে এনে হাজির করে আমাদের সামনে। 'টাইম মেশিনের' সাহায্যে অতীতে ফিরে যাওয়ার ধারণা বিজ্ঞানের কাল্পকথায় পাওয়া যায়। তা যদি বাদও দিই, আমরা কি 'ইথারে' ভাসমান অতীত কাহিনিকে অস্বীকার করতে পারব? যা ছবির মতো জ্যান্ত কিংবা শব্দের মতো বাঙময় হয়ে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের কাছে ধরা দেবে?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসকে সাক্ষী করে আমরা যদি পথ চলতে থাকি, চলার পথে পথে, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে মানুষের নানা জাতি, গোত্র, সম্প্রদায়সমূহের রেখে যাওয়া পদচিহ্নের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। ইতিহাসের বুকে ধারণ করা সব ঘটনা স্বর্ণালি কিংবা বর্ণালি নয়। কোনো কোনো ইতিহাস যেন মানবসভ্যতার কালো অধ্যায়, রক্তাক্ত, বেদনার্ত আর অগৌরবের। সে ইতিহাস আমরা ঘৃণাভরে স্মরণ করি, আপন সত্তার সাথে সম্পর্কিত করতে অস্বীকার করি।

ফলে ইতিহাসের বুকে স্থান পেয়েও কোনো কোনো জাতি-সম্প্রদায় তার অনুজ্জ্বল অবস্থা নিয়ে ম্রিয়মাণ ও ঘৃণার্হ। আর কোনো কোনো জাতির ইতিহাস স্বল্পদৈর্ঘ্য, সভ্যতা ক্ষণিকের কিন্তু সর্বত্র দ্যুতিময় ও কল্যাণবাহী।

একটা কথা আমরা প্রায়ই বলি– মানুষের সভ্যতা তার ইতিহাসের সমান দীর্ঘ। তার সংস্কৃতি তার ঐতিহ্যের সমান বিস্তৃত। ইতিহাসের সাথে ঐতিহ্যের পথে– এই সত্য সন্ধানে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অনুসন্ধিৎসু প্রয়াস।

ইতিহাসের ইতিহাস ও উপাদান

আধুনিক ইতিহাসের জনক হিসেবে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হেরোডটাস। তিনি মানবসভ্যতা বিষয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ব্যাপক অনুসন্ধানের পর গভীর প্রত্যয় ও প্রজ্ঞা দিয়ে অতীতের ঘটনাপ্রবাহকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্য ঘটনাসমূহ বের করে আনেন। অতীতের অসংখ্য ঘটনা অনেকভাবে তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে এসেছে। এসব ঘটনার আধুনিক তথ্যভান্ডার গড়ে তুলে, সেসব তথ্যের মধ্যে যেগুলো অধিক বর্ণনায় এসেছে সেগুলোকে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে ধরে নেন। তাই হেরোডটাস ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে–

> "History is the true and agreeable delineation of the past events. অর্থাৎ, ইতিহাস হচ্ছে অতীত ঘটনাসমূহের সত্য ও সহমত হওয়ার মতো বর্ণনা।"

সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুন মূলত ইতিহাস নিয়েই কাজ করেছেন। ইবনে খালদুন সমাজ সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ প্রায় সকল বিষয়কে ইতিহাসকে ঘেঁটেছেন। এ কথা মানতে হবে– সমাজ ও সভ্যতা যত এগিয়েছে,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানবজীবনে ততই অগ্রগতি হয়েছে। আর এই অগ্রগতি প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই ইতিহাস রচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এ জন্য ইবনে খালদুনের ইতিহাসের সংজ্ঞা একটু ভিন্ন রকম। তিনি বলেছেন–

'মানবসমাজ ও সভ্যতার বর্ণনামূলক উপস্থাপনাই ইতিহাস।'

একটু বিস্তৃত সংজ্ঞা হিসেবে আমরা ১৮৭৬ সালে প্রদত্ত John J Anderson-এর 'A manual of general history' থেকে উদ্ধৃত করতে পারি।

'জাতিসমূহের উত্থান-পতনসহ মানবজাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বড়ো ধরনের পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনাসমূহ, যা মানবসমাজে সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর বর্ণনাকে ইতিহাস বলা হয়।'

Arnold J Toynbee ইতিহাসকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন–

'ইতিহাসকে যদি কাজে না লাগানো হয়, তাহলে ইতিহাস আসলে কিছুই নয়। সকল বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষের জন্য জীবন মানেই কর্ম; অনেকটা ব্যবহারিক জীবনের মতো। আর তুমি যদি ইতিহাসের সকল উপাদানকে ব্যবহার না করো, তাহলে এটা অনেকটাই মৃত হয়ে যেতে পারে।'

সে জন্যই আবার ঘুরিয়ে এনে বলতে হয়, ইতিহাস হচ্ছে অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ও সত্য কাহিনির সমষ্টি।

'It is an umbrella term that relates to past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation and interpretation of information about these events.'

কুরআনে ইতিহাসের আলোচনা

মানবজাতির প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ হেদায়াত গ্রন্থ আল-কুরআন। যুগে যুগে মানবকে বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করে সত্য সঠিক ও আলোকিত রাজপথে ফিরিয়ে আনার জন্যই স্রষ্টা তার পক্ষ থেকে 'ওহি' পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে মানবের প্রথম পদক্ষেপ রচিত হয়েছিল 'আদম' ও 'হাওয়া' (আ.)-এর মাধ্যমে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানব ইতিহাস ও সভ্যতা নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তাদের একটি অংশ বলেছেন– আদিম (প্রাচীন) মানুষ ছিল অসভ্য, বর্বর, নিরক্ষর, গুহাবাসী ও অন্ধকারের বাসিন্দা। কিন্তু কুরআন বলছে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত) হিসেবে প্রেরিত হন। তিনি স্রষ্টা কর্তৃক শেখানো জ্ঞানে শিক্ষিত ছিলেন। অপরদিকে নবিও ছিলেন। ছিলেন আলোকিত মানব, সভ্য মানুষ।

আল কুরআনুল কারিমে মানব ইতিহাসের বড়ো বড়ো সভ্যতা ও জাতিসমূহের উত্থান-পতনসহ অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ আকারে-ইঙ্গিতে ভবিষ্যতের মানুষদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে ৬০০০-এর অধিক আয়াত রয়েছে, যার মধ্যে ১০০০ আয়াতে কাহিনি এবং ১০০০ আয়াতে উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত উদাহরণ ও ইতিহাসভিত্তিক আয়াতে কোনো কোনো ঘটনা পুনরাবৃত্তিও হয়েছে।

কুরআন সম্পর্কে আমাদের জানা রয়েছে– মানব সৃষ্টির অনেক আগেই হেদায়াতের সর্বশেষ গ্রন্থ এই কুরআন হুবুহু 'লাওহে মাহফুজ' বা সংরক্ষিত স্থানে লিখে রাখা হয়েছিল। আর তা মানুষের কাছে প্রেরিত হয় একটি বিশেষ কাঠামোর মধ্য দিয়ে: বিশেষ প্রক্রিয়ায়, ধীরে ধীরে এবং একটি সমাজ, আন্দোলন ও সভ্যতা নির্মাণের স্তরে স্তরে। এ সভ্যতার নাম– ইসলামি সভ্যতা, যা বিশ্বকে হাজার বছরেরও অধিককাল ফুলে-ফলে সুশোভিত করেছে।

কেন এই আলোচনা

কুরআনের এ আলোচনা মূলত গাফিল, বেখেয়াল ও অসতর্ক মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা কুরআন নাজিল হওয়ার সময়কালকে একবার স্মরণে আনি। ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্বলোকে চলে যাওয়ার পর প্রায় ৫৭০ বছর পৃথিবী আর কোনো নবি-রাসূল পায়নি। সমগ্র পৃথিবী এক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ঘুমঘোর সেই তমসায় মানবতা জ্ঞানবিজ্ঞান-সভ্যতা-সংস্কৃতি বিবর্জিত হয়ে বর্বরতার যুগ অতিক্রম করছিল। রোম-পারস্যসহ সমগ্র পৃথিবী খুন-খারাবি আর পাশবিকতায় লিপ্ত ছিল। জাহিলিয়াতুল আরব ছিল আরও ভয়ংকর। পাথরের মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত ছিল তারা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়েও তারা জড়বস্তুর কাছে তাদের মাথা নোয়াত। কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিত। জিনা-ব্যভিচার ছিল স্বাভাবিক কাজ। অপরের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করা, সুদের নিগড়ে শোষণ করা ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাবার মৃত্যুর পর সন্তানরা তাদের সৎমাকে বিয়ে করত। বোনদের শয্যাসঙ্গী করত। এমনই ছিল তাদের অসংযত যৌনাচার।

ঠিক এমন সময়ে মুহাম্মাদ ﷺ এলেন পৃথিবীর বুকে। ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করলেন। ২৩ বছর ধরে নিরলস দাওয়াতি কাজ করলেন। লোকদের সংগঠিত করলেন। কুরআন শিক্ষা দিলেন। নৈতিকভাবে সৎ ও সর্বোত্তম চরিত্রে সুশোভিত করলেন। বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী, সংযমী, প্রত্যয়ী ও ধৈর্যশীল মানুষ হিসেবে তৈরি করলেন। তাদের মাধ্যমে জাহেলি যুগের সমাজব্যবস্থার বিপরীতে এমন এক সমাজ তৈরি করলেন, যেখানে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ছিল সমান। কালোর ওপর সাদার কিংবা সাদার ওপর কালোর কোনো প্রাধান্য থাকল না। প্রাধান্যের একমাত্র মাপকাঠি নির্ধারিত হলো– খোদাভীতি ও সততা। মদ, জুয়া, সুদ, ব্যভিচারসহ সব অনাচার নিষিদ্ধ হলো। একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠল।

৫৩ বছর বয়সে নিজ ভূমি থেকে পরবাসী হয়ে মদিনায় ছোট্ট রাষ্ট্র গড়ে তুললেন। এ রাষ্ট্রের ভিত তৈরি হলো সততা, কল্যাণ, ইনসাফ, আদর্শ, সুকৃতি ও উন্নত মানবতার ওপর। ৬৩ বছর বয়সে তিনি যখন পরলোক গমন করার আগেই মক্কা বিজয় করেন, তখন সমগ্র জাজিরাতুল আরব তাঁর রাজ্যসীমায় চলে আসে। রোম-পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আর তাঁর মৃত্যুর পর ২০ বছরের মধ্যে জানা পৃথিবীর অর্ধেকটা তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের আওতায় চলে আসে। এই যে বিশাল পরিবর্তন, তার পেছনে অন্যতম নিয়ামক শক্তি ছিল 'আল কুরআন'। বিশেষ করে আল কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসসমূহ। এসব ইতিহাস কয়েকটি কারণে উল্লেখ করা হয়। যেমন–

এক পৃথিবীর বুকে আগেও যেসব জাতি শিরক ও কুফরনির্ভর হয়ে মানুষের ওপর দুঃসহ শাসন চালিয়েছিল, তাদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে জানানো এবং সাবধান করা।

দুই যে সমস্ত সভ্যতার ধারক-বাহকরা দোর্দণ্ড প্রতাপে এক ধরনের দুর্দমনীয় শক্তিমত্তা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি দিয়ে পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিল, তাদের (নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তনের কারণে) ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিমজ্জিত হওয়ার বর্ণনা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন অনৈতিকতার ফলে বিপর্যস্ত মানবসভ্যতার মূলোৎপাটন করে পরাক্রমশালী স্রষ্টা কী করে নৈতিক বিজয় দিয়েছেন, তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করা।

চার সভ্যতার আবর্তন, সংস্কৃতির বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিকতার যে চক্র, তা পরিষ্কার করে তুলে ধরা।

পাঁচ আল কুরআনে কিছু অতীত ইতিহাসের বর্ণনা আছে, যা ওই সময়কার মানুষের কাছে অন্য মাধ্যমে আসেনি। আবার কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছে, যা মানুষের সাধারণ বোধগম্যতায় আসার কথা নয়। অথচ, আমরা আগেই বলেছি, এসব কথামালা মানবযাত্রা শুরুর অনেক আগেই রচনা করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো– যিনি এই গ্রন্থের রচয়িতা, তিনি একই সাথে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যক অবহিত; বরং বলা যায়– এ সবই তাঁর রচনা। তিনি স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে। তাঁর কাছে তিনটি কালের অবস্থান একই সমতলে। সবচেয়ে বড়ো কথা– আমাদের কাছে যা গত হয়ে গেছে, যা বর্তমান হচ্ছে কিংবা আগামী হবে, তার সবকিছুই সৃষ্টির বহু আগে তিনি ঘটনাপরম্পরায় সাজিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে একটি প্রকল্পের 3D ভিডিও বানানোর মতো। এটি বরং তার চাইতেও সহজ। এ জন্য তিনি মানুষকে এই প্রযুক্তিগত জ্ঞান দিয়েছেন।

কুরআনে মানবসভ্যতার ইতিহাস

- কুরআনে একটি আলাদা সূরা আছে, যার নাম 'আসর' বা কাল। এটিকে বলা হয় কুরআনের ইতিহাস-দর্শনের দলিল। সেখানে ইতিহাসকে অতি সংক্ষিপ্ত একটি মূল্যায়ন দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'কালের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।' ইতিহাস সাক্ষী দেয়, আসলেই মানবের বৃহদাংশ শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে নিজেকে ক্ষতিকর কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে। তবে তারা ব্যতীত, যারা বিশ্বাস পোষণ এবং সৎ কাজ করে। যারা অন্যকে সত্যনিষ্ঠ থাকার শিক্ষা দেয় এবং ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

• কুরআনুল কারিমে বড়ো বড়ো জাতির মধ্য থেকে আদ, সামুদ, লুত, বনি ইসরাইল, আইকা জাতির উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত জাতি পৃথিবীতে অনেক শৌর্য-বীর্যসহ সভ্যতার ধারক-বাহক ছিল। একটি পর্যায়ে অনৈতিকতা ও বাড়াবাড়ির চরম পর্যায়ে পৌঁছে এসব জাতি মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। ওই নৈতিক দেউলিয়াপনার সময়কালে তাদের কাছে প্রত্যাশিত সত্যের আহ্বান নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নবি-রাসূলগণ। কিন্তু ওইসব জাতি তাদের সাথে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেছে। সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কখনো সত্যের আহ্বায়কদের করাত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করেছে, কখনো গর্ত করে সেখানে ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, কখনো লোহার আঁচড়া দিয়ে তাদের গায়ের চামড়া-হাড় ঘসিয়ে নিয়েছে, কখনো গোটা জাতি বেহায়াপনার চরমে পৌঁছেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈতিকতার ভিত্তিতে বৈবাহিক বন্ধন গড়ে তোলার পরিবর্তে যৌন স্বেচ্ছাচারিতায় মত্ত হয়েছে। অন্যের ধন-সম্পত্তি জোর করে দখল ও ভোগ করা কোনো ব্যাপারই ছিল না। কুরআন ওইসব জাতির শেষ পরিণতিগুলো উল্লেখ করে প্রমাণ করেছে যে, শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারেনি।

বিশেষ করে ইতিহাসের পরাক্রমশালী ফেরাউন, হামান, নমরুদের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। জালিমদের হাতে নবিদের নির্যাতনের কাহিনির পাশাপাশি তাদের যে মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি, তা-ও তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন—

> 'আর আমি এই কুরআনে তাদের বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু তা কেবল তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি করে চলছে।' সূরা বনি ইসরাইল : ৪১

• কুরআনের ইতিহাস বর্ণনায় জাতি ও সভ্যতার ভিত্তি আলোচনা করা হয়েছে। সূরা বনি ইসরাইল এ ক্ষেত্রে আমাদের সামনে বড়ো উদাহরণ। এখানে বনি ইসরাইলকে যে ১৪ দফা সমাজবিধান দেওয়া হয়েছিল, তা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে একটি সুশীল, সভ্য ও সংস্কৃতিবান সমাজের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তা বলা হয়েছে। একনজরে সেগুলো ছিল—

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১. এক আল্লাহর দাসত্ব
২. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার
৩. আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরের হক আদায়
৪. বাজে খরচ না করা
৫. আত্মীয়স্বজন, মিসকিন ও মুসাফিরের হক আদায়ে সমর্থ না হলে তাদের সাথে নরমভাবে কথা বলা
৬. কার্পণ্য না করা, আবার অপব্যয়ও না করা
৭. অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা না করা
৮. ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া
৯. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা
১০. ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা
১১. প্রতিশ্রুতি পালন
১২. ওজনে কম না দেওয়া
১৩. যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ের পেছনে না লাগা এবং
১৪. জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা না করা।

- কীভাবে ফেরাউনকে বারবার সুযোগ দেওয়া হলো, শেষ পর্যন্ত নদীতে সদলবলে ডুবিয়ে মারা হলো এবং তাকে অনাগত মানবতার সামনে একটি নিদর্শন বানিয়ে রাখা হলো– কুরআনুল কারিমে সে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে– নমরুদের ধনসম্পদ আর প্রতাপের কাহিনি এবং ইবরাহিমের প্রতি তার নির্যাতনের কাহিনি, অবশেষে সামান্য মশার কবলে তার মৃত্যুর কাহিনি। গর্ত খননকারী শাসক, তাদের লোমহর্ষক হত্যা-কাহিনি এবং তাদের ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত হওয়ার কাহিনি। আইকাবাসী ও মাদিয়ানবাসীর অত্যাশ্চর্য সভ্যতার কথা এবং খোদাদ্রোহিতার শাস্তিস্বরূপ তাদের পতনের গল্প। লুত জাতির নৈতিক অধঃপতন আর তার ফলে তাদের উলটে দেওয়ার ইতিহাস।

মুহ নবির সাথে তাঁর জাতির দুর্ব্যবহার, ঐতিহাসিক বন্যায় জাতির বিভ্রান্ত মানুষদের ধ্বংস হওয়া এবং জাহাজে করে অনুসারীসহ বেঁচে যাওয়ার কাহিনি। কুরআনে ২৫ জন নবির ঘটনা ও ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের স্ব-স্ব জাতির অসদাচরণের বর্ণনা এবং ওই জাতির পরিণতিও আলোচনা করা হয়েছে। আবার নবি সুলাইমান, দাউদ, সাবার রানির কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের অসদাচরণ, তাঁর বেড়ে উঠা, মিশরের মন্ত্রীর ঘরে থাকা, মন্ত্রীর স্ত্রী কর্তৃক তাকে কুপ্রস্তাবে রাজি করতে না পেরে জেলে প্রেরণ, তাঁর মুক্তি, তাঁর মন্ত্রী হওয়া, ষড়যন্ত্রকারী ভাইদের আবার তাঁর কাছে ফিরে আসা এবং তাঁর পিতার ছেলেকে ফিরে পাওয়াসহ পুরো কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো–

> সেখান থেকে পরবর্তী যুগের মানুষরা শিক্ষালাভ করে নতুন সমাজসভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ সম্পর্কে স্রষ্টা প্রদত্ত দিকনির্দেশনা উপলব্ধি করতে পারে।

- কুরআনুল কারিমে সূরা ফিলে আরববাসীর সামনে একটি নিকট অতীতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে–

> 'তুমি কি দেখেছ হস্তিবাহিনীর সাথে তোমার প্রতিপালক কীরূপ আচরণ করেছেন?' সূরা ফিল : ১

মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মের কিছুদিন আগে এই ঘটনা ঘটে। ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা চেয়েছিল কাবার দিক থেকে মানুষকে ফিরিয়ে তার প্রতিষ্ঠিত একটি ইবাদতখানার দিকে আকৃষ্ট করতে। এ জন্য সে কাবা ধ্বংস করার মানসে এক বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করতে আসে। তার পরাক্রম সম্পর্কে ধারণা থাকায় কাবার মুতাওয়াল্লি আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর লোকজন ভয়ে কাবার মালিকের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। আবরাহা ও তার লোকজন কাবার অদূরে মিনা পর্যন্ত এলে তাদের হাতিগুলো বসে পড়ে। আকাশে একদল ছোটো পাখি (আবাবিল) সংঘবদ্ধ হয়ে ছোটো ছোটো পাথর বয়ে এনে তাদের গায়ে নিক্ষেপ করে। এসব ছোটো ছোটো পাথরের আঘাত ও প্রতিক্রিয়ায় হাতি এবং হাতির পিঠে আরোহীরা চর্বিত খাবারের মতো ধুলায় মিশে যায়। এমন একটি তাজা ঘটনা কুরাইশদের অস্বীকার করার কোনো সুযোগ ছিল না। তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই ঘটনা জানত।

কুরআনে এই কাবাঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও বর্ণনা করা হয়েছে। জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে শিশু ইসমাইলকে তাঁর মায়ের সাথে রেখে যাওয়া, ক্ষুধাকাতর তৃষ্ণার্ত ইসমাইলের কান্নায় পদাঘাতে 'জমজমের' উৎপত্তি, তাকে কেন্দ্র করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের বসতি গড়ে উঠা, পিতা-পুত্রের যৌথ পরিশ্রমে 'কাবাঘর' নির্মাণ, মিনায় পুত্র কুরবানির চেষ্টা এবং তাকে কেন্দ্র করে পশু কুরবানির সংস্কৃতি গড়ে উঠাসহ সামগ্রিকভাবে একটি মুসলিম মিল্লাতের পত্তন, তাদের সভ্যতার ধারাবাহিকতার সূচনা ও বিকাশ– সবকিছুই কুরআনে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনের ইতিহাস বর্ণনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

কুরআন যতগুলো ইতিহাস বর্ণনা করেছে, তাতে কোনো রকম কমতি বা ঘাটতি নেই। কেবল সংঘটিত ঘটনার সঠিক চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। অতিশায়ন কিংবা কমানোর কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।

ইতিহাস বর্ণনা করেই বলা হয়েছে– ইতিহাসের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার কেউ আছে কি না। কোনোকালে কেউ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি।

কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসের নিদর্শনসমূহ প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ, তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন বর্তমানের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, লেজার গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অতীতের অনেক ছোটো ছোটো শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে মিশরের পিরামিড, পেত্রার শিলা পর্বতে খোদাই করা শহর, দালান-কোঠা, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, আবিষ্কৃত ফেরাউনের মমি, আরদুল কুরআন বা কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহে বিরাজমান বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় নিয়ে গবেষণা এবং লেখালেখি হচ্ছে।

এ স্থানে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, কুরআন মানবসভ্যতার বড়ো বড়ো ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে বর্ণনা করেছে। বিপর্যস্ত মানবতাকে রক্ষা করতে হলে আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষকগণ ইতিহাস বর্ণনা, রচনা, সংরক্ষণ ও চর্চার ক্ষেত্রে কুরআনের শৈলী মেনে চলতে পারেন।

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস মানুষকে নিয়ে কাজ করে। এখানে মানুষের জৈবিক ও মানবিক সত্তার বিকাশ, আর্থ-সামাজিক-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক পরিপক্কতা, ধর্ম, শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতার পথে পথে বেড়ে উঠা– এ সবকিছুরই আলোচনা থাকে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা মানব ইতিহাসে অনেক সভ্যতার সাক্ষাৎ পাই। ইতিহাসে এসব সভ্যতার একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করা আছে। যেসব এলাকায় বা স্থানে মানুষ ওই সভ্যতার প্রাবল্য দেখতে পায় তা-ও স্থির হয়ে আছে। একই স্থানে রয়েছে সভ্যতার জীবনকাল। একটি সভ্যতার জন্ম যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ধীরে ধীরে তার শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছানোর তীব্রতার ক্রমধারা এবং সেই শীর্ষবিন্দু থেকে উলটো নিয়মে ধ্বংসের পশ্চাদযাত্রার ঘটনাও। একত্রিত সময়কালের মধ্যে সভ্যতার জন্ম-বৃদ্ধি-পতনের চক্র শেষ হয়।

ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান উপাদান সত্যবাদিতা। এ সত্যনিষ্ঠতা অতীতের ঘটনাকে নিখাঁদভাবে তুলে ধরতে সহায়তা করে। সত্যিকারের ইতিহাস তিক্ত কথা নয়; আবার নয় কেবল ঘটনা, কার্যক্রম বা দিবসসমূহের সাদামাটা সমষ্টি। 'সত্য নয়' এমন কিছুকেই যেমন ইতিহাস গ্রহণ করে না, আবার সকল ছোটো ছোটো সত্য ঘটনা ও লেনদেনকেও আমলে নেয় না। Lord Bdingbroke-এর কথায় বলা যায়–

'History is philosophy teaching by example.'

আবার Shakespeare-এর ভাষায় তা অন্যরকম–

'There is history in all men's lives,
Figuring the nature of the times deceased,
The which obraerrd, a men may prophesy,
With a near aim, of the main chance of things.'

ইতিহাস কেবল আহরণ দিয়ে শিক্ষাদানের দর্শন নয়। ইতিহাস জ্ঞান, শিল্পকলা, আচার-আচরণ ও মানবিক প্রয়াসের ধারাবাহিক উন্নতি-প্রগ্রসরতার বর্ণনা।

ইতিহাসের দুটি মুখ্য উৎস রয়েছে। যার একটি হচ্ছে বিধিবদ্ধ আইন এবং অপরটি অপরাধ বিচারিক আদালতের কার্যবিবরণী।

ইতিহাসের একটি কাজ হলো, বর্তমানের একটি সভ্যতা বা জাতি অতীতের একটি বড়ো সভ্যতা বা জাতির সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যশীল বা ব্যতিক্রমী– তা অনুসন্ধান করা। মানুষের অতীতের সাথে পরিচিতি (acquintance) হচ্ছে এই জ্ঞান অন্বেষার পথ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের সীমাবদ্ধতা এবং ইতিহাসের সংকট

মানুষের রয়েছে অনেক মানবিক সীমাবদ্ধতা। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির আশ্চর্যজনক বিকাশের পরও মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য– মানুষ মাত্রই মরণশীল, মানুষ মাত্রই ভুল, ব্যক্তিজীবনে মানুষ খুবই সীমাবদ্ধ এক প্রাণী। নির্দিষ্ট তার হায়াতে জিন্দেগি। শৈশবে ও বার্ধক্যে সে এক অসহায় প্রাণী, যদিও যৌবনে দুর্দান্ত প্রতাপময়। তার দৈহিক সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য, শক্তি, সম্পদ সবকিছুই হীন, দুর্বল ও অসহায়।

একটি সভ্যতা যখন যৌবনে থাকে, তখন ওই সভ্যতার ধারক-বাহক ও শাসকগোষ্ঠী তার ইতিহাস রচনাকার। বিশেষ করে কাগজ-কলম-কালির আবিষ্কার, মানুষের প্রথাগত ইতিহাস রচনার সূচনা ও বিকাশ লাভ করার পর একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আর ছাপাখানা, ইলেকট্রনিক মুদ্রণ প্রক্রিয়া, বর্তমানের সামাজিক মাধ্যমসমূহ এবং অনলাইন বিশ্বের গতিশীলতা এই কাজটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। সময়ের সাথে সাথে এখন চলছে একটি অসুস্থ প্রবণতা। তা হলো ইতিহাস বিকৃতি। আধুনিক বিশ্বে একটি প্রতিষ্ঠিত প্রবচন রয়েছে– 'History is written by the victors' অর্থাৎ বিজয়ীরাই ইতিহাসের স্রষ্টা বা রচয়িতা।

একটি বিজিত জাতির ওপর প্রবল পরাক্রমে বিজয়ী হয়ে গেলে বিজয়ী জাতির জয়জয়কার শুরু হয়। তখন ওই বিজয়ী জাতি তাদের দেশের ও সমাজের একটি নতুন ইতিহাস লিখে ও শেখে। এর জন্য আমাদের অনেক দূর যেতে হবে না। হাতের কাছেই রয়েছে ভুরি ভুরি উদাহরণ।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ৮০০ বছর মুসলমানরা শাসন করে। তাদের শাসনামলে এ দেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমরা তাদের সামাজিকভাবে মর্যাদা, সম্মান, রাজদরবারে চাকরি-বাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে অবাধ সুযোগ দিয়েছিল। মুসলিমরা রাষ্ট্র ও রাজকার্যের ভাষা হিসেবে ফার্সি ব্যবহার করতেন। এখানে অনেক মসজিদ, মক্তব, খানকাহ, মাদরাসা গড়ে উঠেছিল। সামাজিক আচার-আচরণে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। ফলে তখন ইতিহাসের যে বই-পুস্তক ছিল, তাতে মুসলিম শাসকদের কীর্তিগাথা উল্লেখ ছিল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যখনই ব্রিটিশরা বণিকবেশে এসে ১৭৫৭ সালে এখানকার রাজ্য দখল করে রাজদণ্ড হাতে তুলে নিল, তখনই এখানকার সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার-আচরণ পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ ঘরানায় রূপান্তরিত হলো। যেহেতু বিজিত মুসলমানদের ক্ষমতা, ভূমি-জমা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি সবকিছু পর্যায়ক্রমে ইংরেজদের এ দেশীয় দোসর হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়, সেহেতু তাদের একটি প্রভাব সবকিছুতেই লক্ষ করা যায়। ক্ষমতা দখলের ৭৮ বছর পর ইংরেজরা শিক্ষাব্যবস্থা বদলে ফেলে। আর সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যেতে থাকে ইতিহাস রচনা ও বর্ণনার ধরন। সিলেবাসও বদলে যায় খুব দ্রুতই।

সভ্যতার ইতিহাস যেন কেবল ব্রিটিশেরই তৈরি আর মুসলিমরা অসভ্য এবং বর্বর একটি জাতি! যাদের নেই কোনো ইতিহাস, নেই কোনো সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি কিংবা অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়।

ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম

দুই দেশে আলাদা আলাদা ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তানে ইতিহাস বইয়ে মুসলিম ইতিহাস এক রকম, আর ভারতের ইতিহাসে অন্য রকম। সেই যে অখণ্ড ভারত, যেখানে প্রায় ৮০০ বছর শাসন করে মুসলমান, রক্ষা করে সকল জাতি-ধর্ম ও বর্ণের মানুষের ইজ্জত-সম্মান-আবরু, তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বাধিকার ও সুযোগ দেয়– সেই ইতিহাসটাই পালটে যায়। ভারতীয় বই-পুস্তকগুলোতে কেবলই মুসলিম শাসকদের রক্ত লোলুপতা, মন্দিরকে মসজিদ বানানো, হিন্দুকে প্রভাব খাটিয়ে মুসলিম বানানো ইত্যাদি আজগুবি কাহিনি রচিত হয়। বিজিত বলে মুসলমানরা সেখানে কিছুই বলতে পারে না। বাধ্য হয় সেই মিথ্যা ইতিহাস গিলতে।

এবার তাকানো যাক বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে।

১৯৭১ সালে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ লাভ করেছে স্বাধীন ভূখণ্ড, লাল-সবুজ পতাকা এবং দেশ চালানোর ম্যান্ডেট। বিগত ৪৭ বছরে বাংলাদেশে দেশ পরিচালনার ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। ক্ষমতার এই হাতবদলের মধ্যেই দেশ কয়েকবার ইতিহাস লিখে হয়েছে নতুন নতুন বিতর্ক ও সংঘাত। ইতিহাস কি তাহলে কোনো দালিলিক প্রমাণ ছাড়াই রচনা করা হচ্ছে?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখনও আমরা ক্রমাগত বিতর্ক করছি– স্বাধীনতার ঘোষক কে? কত মা-বোন প্রাণ হারিয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে? ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর ইতিহাস নিয়ে আমরা কি ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছি? এভাবে ক্ষমতার হাতবদলে যারাই ক্ষমতায় এসেছেন, প্রত্যেকেই আগের সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ান, দুঃশাসনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন এবং করছেন। আসলে এতে কখনো কি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোনো সঠিক ইতিহাসের সন্ধান পাবে?

ইতিহাস বিকৃতি

এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে কোনো জাতিই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। দৃষ্টি প্রসারিত করে যদি একবার তাকাই ইরান, তুরস্ক, মিশর, ফিলিস্তিন, ইজরাইল, বলকান, রাশিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, কুয়েতের দিকে– দেখব বিজিতের ওপর বিজয়ীর প্রতিশোধ নেওয়ার দৃশ্য। একটি নিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বলা খুব জরুরি মনে করছি– বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির এই যুগে সত্য কিন্তু আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে বেরিয়ে আসবে। শাসকরা যতই ইতিহাস বিকৃত করুক না কেন, উইকিলিকস কিংবা তার চাইতেও ভয়ংকর সুন্দর কোনো মাধ্যম তাদের দিকে করুণার হাসি হেসে ইতিহাসের বিকৃত অধ্যায়গুলোর প্রকৃত পাঠোদ্ধার করে আনবেই।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

শৈশব থেকে জেনে এসেছি History repeats itself। কিন্তু কখনো তার সত্যতা নিয়ে ভাবিনি। এখন ভাবতে হচ্ছে। ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হওয়ার অর্থ কী?

এর অর্থ কি এমন, একবার আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বাধীন হওয়ার জন্য লড়াই করেছিলাম। ১৯৭১-এ মুক্তির লড়াইয়ে অসংখ্য শহিদের জীবনের বিনিময়ে বিজয় লাভ করেছিলাম; ছিনিয়ে এনেছিলাম আরাধ্য স্বাধীনতা। সেই দেশের মানুষকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এখন কি আবারও আরেকটি লড়াই জরুরি হয়ে পড়বে?

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক না হোক, ঘুরে-ফিরে ক্ষমতার হাতবদল হয়। আজ যারা ক্ষমতায় কয়েক বছর পর তারা বিরোধী দলে। আবার যারা আজ বিরোধী দলে, তারাই কয়েক বছর পর ক্ষমতায়। সেই বিখ্যাত কথাটা কিন্তু সত্য হলো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা– ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। নমরুদ থেকে শিক্ষা নেয়নি ফেরাউন। ফেরাউনের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়নি কিসরা ও কায়সার। কিসরা থেকে শিক্ষা নেয়নি রেজা শাহ পাহলভি। আমাদের যেন ঘোরকাটা দশা। ইতিহাসে আমাদের মগজ খুলছে না। আমরা সেই তিমিরে সেই তিমিরে থাকাটাই পছন্দ করছি। ঘুরে-ফিরে হালাকু খান, চেঙ্গিজ খানের প্রেতাত্মা আমাদের রাহুর মতো ভর করে আসছে।

ঐতিহ্য : কী, কেন, কীভাবে

যাদের ইতিহাস নেই, তাদের ঐতিহ্য নেই। যে জাতির ইতিহাস যত প্রাচীন, সে জাতির ঐতিহ্যও তত গৌরবের। ইতিহাস তো ঘটে যাওয়া অতীতের ঘটনাপ্রবাহের সত্য ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনা মাত্র। এসব বর্ণনায় যেমন ভালো আছে, তেমনি মন্দ অংশ থাকাটা অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অসম্ভব নয়। এ কথা মানতে হবে, কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ তার নিজের জীবনের অন্ধকার দিক নিয়ে গর্ববোধ করে না। তেমনি কোনো জাতি তাদের ইতিহাসের কোনো কালো অধ্যায়ের দিক স্বীকার করতে চায় না; বরং সম্ভব হলে মুছে দিতে চায় সমস্ত কালিমার চিহ্ন। ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়গুলো হচ্ছে– কলঙ্কতিলক।

ঠিক এর বিপরীতটাই হচ্ছে ঐতিহ্য। আমরা যখন বলি– অমুক একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান, অমুকের বংশীয় ঐতিহ্য উল্লেখ করার মতো কিংবা অমুক জাতি বিরাট বড়ো ধারক-বাহক, তখন বোধ হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজ উদ্বুদ্ধ, উদ্বেলিত ও আহ্লাদিত হয়। এ নিয়ে তারা সত্যি সত্যি গৌরব বোধ করেন। আর এ জন্যই বলা হয়–

> 'Traditions are the golden parts of any history'
> অর্থাৎ, ইতিহাসের স্বর্ণালি বা গৌরবময় অংশগুলোই ঐতিহ্য।'

যেমন : আমরা বলি– বাঙালির রয়েছে সংগ্রাম ও আন্দোলনের ঐতিহ্য, তখন আমরা সবাই আনন্দিত হই। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-আন্দোলন, ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ৯০-এর দশকের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন আমাদের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা মীরজাফরদের দেশবিরোধী ভূমিকা, স্বৈরাচারী শাসক ও তাদের দোসরদের ভূমিকা ইতিহাসের অংশ হওয়া সত্ত্বেও কোনো অবস্থায়ই আমাদের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় বা ঐতিহ্য মনে করি না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঐতিহ্য কেন

ঐতিহ্য থাকা চাই এই জন্য যে, ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মের সামনে আলোকিত পথের সন্ধান দেয়। যখনই কোনো জাতীয়, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বিপর্যয় বা দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হয়, তখন ঐতিহ্য তাদের সচেতন করে। ঐতিহ্যের পথ ধরে তারা আবার লড়াই করতে শেখে। তারা আবার উচ্চারণ করে, 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।' একইভাবে তারা যুথবদ্ধ হয়ে শোষণ, শাসন, নিপীড়ন, নিবর্তন ও জুলুমের শৃঙ্খল ভাঙতে শপথবদ্ধ হয়। তারা গেয়ে উঠে সাহস ও হিম্মতের সাথে–

'এ দেশ খানজাহানের, এ দেশ শাহ মাখদুমের...'

'এই ওলি আল্লাহর বাংলাদেশ, এই শহিদ গাজির বাংলাদেশ,
রহম করুন আল্লাহ, রহম করুন আল্লাহ।'

এই গানে খানজাহান, বায়েজিদ, শরিয়তুল্লাহ, তিতুমিরের ইতিহাস স্মরণ করে, তাদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রত্যয় ঘোষণা করে আল্লাহর রহমত চাওয়া হচ্ছে। এটাই হচ্ছে ঐতিহ্যের প্রয়োজন।

ঐতিহ্য গর্ব, আনন্দ ও সাহসের উৎস। ঐতিহ্য আত্মমর্যাদা, জাতীয় গৌরব ও সম্মানের উৎস। একটি ঐতিহ্য-সচেতন পরিবার, জাতি কিংবা সমাজ ক্ষুধায় কাতর হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে জীবন দিয়ে লড়াই করতে পারে, কিন্তু অসম্মান ও জিল্লতির একটি মুহূর্তকেও মেনে নিতে রাজি থাকে না।

ব্যক্তিসমষ্টির অংশ

ঐতিহ্য ব্যক্তির একক কিছু নয়, সামষ্টিক। ব্যক্তির গৌরবগাঁথা তার ব্যক্তিত্বের অর্জন। আর সমষ্টির গৌরবগাঁথা তার ঐতিহ্যের অংশ। ঘরের দেয়ালটি যেমন অনেক ইটের তৈরি, তেমনি সমাজ অসংখ্য মহৎ ব্যক্তির তৈরি। সমাজ ওই ব্যক্তিদের অস্বীকার করে না, কিন্তু ব্যক্তির চেয়ে সমাজটাই বড়ো। তেমনি সমাজের গড়ে তোলা একটি ঐতিহ্য প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে প্রভাব ফেলে। তার ব্যক্তিত্বে ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠনের ঐতিহ্যসমূহ গড়ে উঠে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে। নিচের কথাগুলো লক্ষ করি–

- একটি পরিবারের সাধারণ ভদ্রতা হচ্ছে, বড়ো-ছোটো যাকেই দেখে, সবাই সবাইকে সালাম দেয়। তারা কোনো হারাম খাদ্য বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঢুকতে দেয় না। তাদের মেয়েরা কখনো বেপর্দা হয়ে ঘর থেকে বের হয় না। তাদের মেয়েদের উচ্চকণ্ঠ কেউ কোনো দিন শোনে না। কোনো ছেলেমেয়ে কমপক্ষে স্নাতক না পড়ে পড়ালেখা শেষ করে না। কিংবা এ বাড়ির সবাই আলেম অথবা শিক্ষক অথবা চাকুরিজীবী। এসব হতে পারে তাদের ঐতিহ্য, যদি তা ক্রমাগত কয়েক পুরুষ ধরে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

- একইভাবে একটি সমাজে সবাই নামাজ কায়েম করে। রমজান মাসে সবাই রোজা রাখে। জামায়াতে তারাবিহ আদায় করে। কেউ কোনো মিথ্যা কথা বলে না। কারোর হক কেউ নষ্ট করে না। দলাদলি করে না। এই সমাজ থেকে মেহমান খালি মুখে ফিরে যায় না। এই পাড়ার সবাই সবাইকে সম্মান, শ্রদ্ধা কিংবা স্নেহ করে।

- একটি রাষ্ট্রের বিগত ৫০ বছর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান। ক্ষমতায় যারাই আসেন, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েই আসেন। গণতান্ত্রিক রায় হাসিমুখে মেনে নেন। সংবিধান সমুন্নত, বিচার বিভাগ স্বাধীন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত। রাজনীতিবিদ ও আমলারা দুর্নীতিমুক্ত।

ওপরের বিষয়গুলো ব্যক্তি, সংগঠন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কতিপয় ঐতিহ্যের উদাহরণ। এই রকম ঐতিহ্যের অংশ হতে পারা গৌরবের। এই রকম সমাজের বাসিন্দা হতে পারা নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার এবং এমন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারা প্রশান্তির ব্যাপার।

সামাজিক ঐতিহ্য, শিক্ষার ঐতিহ্য, বিনোদনের ঐতিহ্য, পারিবারিক ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য– এভাবে নানাভাবে আমরা ঐতিহ্যের বিভাজন করতে পারি। যাদের জীবনে যত ঐতিহ্যের সংযোগ, তারা তত বেশি ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন সচেতন লোকেরা ঐতিহ্যপ্রিয় হয়ে থাকেন। অর্থবিত্তে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখেন। তারা হতদরিদ্র হতে পারেন, কিন্তু মননে-চিন্তে বিত্তশালী হয়ে থাকেন। জীবনকে ঋদ্ধ করার জন্য তারা হয়ে থাকেন ঐতিহ্য-সন্ধানী এবং ঐতিহ্য-অনুসারী।

একজন আল-আজহারি (মিশরের ঐতিহাসিক আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে হাজার বছরের ঐতিহ্যের বাহক। একজন ক্যামব্রিজিয়ান আধুনিক শিক্ষায় শত শত বছরের ঐতিহ্যের অংশ। একজন ব্রিটিশ শত শত বছরের গণতন্ত্রের অনুসারী। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা তাকে ঐতিহ্যময় করে তোলে।[৬]

তথ্যপঞ্জি :

১. আল কুরআন, আলে ইমরান-১০৩, ১১০, ১৩৯, বাকারা-৪৩, মাআরিজ-২৫, হজ-৪১, তওবা-১১১.

২. ক্রুসেডের প্রতিচ্ছায়া, মুহাম্মদ আসাদ, মুহাম্মদ আসাদ : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, দি পাইওনিয়ার, পৃষ্ঠা ১১৪, ১২০।

৩. ক্রুসেড ও মুসলিম বিশ্ব, ডা. মুহাম্মদ গোলাম মোয়াজ্জেম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৬৫২।

৪. রিচার্ড : চেঙ্গিজ, বেগিন, সামিউল আহমদ খান, ই.ফা. পত্রিকা. মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা ১৯৮৪. পৃষ্ঠ : ৬৬৬

৫. 'কর্ডোভা মসজিদ' আল্লামা ইকবাল; বালে জিবরিল।

৬. 'উন্দুলস মে ছান্দ' আল্লামা তকী ওছমানী

৭. 'ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত' আসকার ইবনে শাইখ, মদিনা পাবলিকেশন্স।

---

*. তবে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে– পূর্ববর্তী অনেক জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেছেন তাদের ঐতিহ্য ও বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুসরণের জন্য। তাই এই উম্মাহর আলেমদের ইজমা হচ্ছে– ঐতিহ্য বা যে কারও অনুসরণ যদি ইসলামি শরিয়তের ন্যূনতম কোনো বিষয়েরও সাংঘর্ষিক হয়, তাহলেও তা হারাম। আর কেউ যদি অনুসরণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহেলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করবে।